নেহরু বাল পুস্তকালয়

প্রেমচন্দ

অমৃত রাই

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নেহরু বাল পুস্তকালয়—47

প্রেমচন্দ

অমৃত রাই

অনুবাদ
শেখর বসু

ছবি
সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1

প্রেমচন্দের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তরুণ চন্দ্রহাসন কেরালা থেকে বারাণসী এসেছেন। অনেক খোঁজাখুজি করে তিনি শেষ পর্যন্ত লেখকের বাড়ি খুঁজে পেলেন। কিন্তু বিস্তর ডাকাডাকি করার পরেও বাড়ি থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না। অগত্যা তিনি সামনের খোলা দরজা দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারলেন ভেতরে। ঘরের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া গোঁফ-ওয়ালা লোক একটা ছোট্ট চৌকির ওপর বসে একমনে কী যেন লিখছিল। ঘরে জিনিসপত্তর বলতে কিছু নেই। গোঁফওয়ালা লোকটার চেহারা একেবারে সাধারণ, তাকে দেখে এই আগন্তুকের মনে হল লোকটা নির্ঘাত বিখ্যাত লেখকের কোনো কেরানী-টেরানি হবে।

তরুণটি এবার ঘরে ঢুকে বলল, "আমি মুন্সী প্রেমচন্দের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।" তাই না শুনে প্রেমচন্দ অবাক হয়ে তরুণটির দিকে তাকালেন, তারপর হাতের কলম নামিয়ে রেখে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই দেখা হবে—কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।"

তরুণ উর্দু কবি নাশাদ একবার প্রেমচন্দের সঙ্গে দেখা করতে লখনউতে গিয়েছিলেন। তিনি আগে কখনও প্রেমচন্দকে দেখেন নি। প্রেমচন্দ কোন অঞ্চলে থাকেন মোটামুটি জানলেও বাড়িটা ঠিক চিনতেন না। রাস্তার একটা লোককে তাই জিজ্ঞেস করলেন, "মুন্সী প্রেমচন্দের বাড়িটা আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন?" লোকটাকে গেঁয়ো-গোছের দেখতে, পরনে আধময়লা ধুতি আর গেঞ্জি।

লোকটা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় দেখিয়ে দেব, আসুন।"

তরুণ কবি লোকটার পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলেন। একটু পরেই ওরা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে প্রায় খালি একটা ঘরে এসে ঢুকল ওরা। লোকটা নাশাদকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই লোকটা ফিরে এল গেঞ্জির ওপর একটা জামা চাপিয়ে।

লোকটার মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি, হাসতে হাসতেই বলল, "মুন্সী প্রেমচন্দ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, কী বলবেন, বলুন।"

1934 সালের এপ্রিল মাস। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হিন্দী লেখক সম্মেলন। এই সম্মেলনে কথাসাহিত্য বিভাগের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন প্রেমচন্দ। তিনি তখন তাঁর খ্যাতির শীর্ষে, কিন্তু তাই বলে তিনি উদ্যোক্তাদের কাছে বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা দাবী করেন নি। প্রখ্যাত হিন্দী ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকুমার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি এখানে এসে আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতো ছিলেন। তাঁর শোবার জায়গা ছিল বারোয়ারি শোবার ঘরে। শোবার ঘরটা ছিল ঠিক হাসপাতালের সাধারণ বিভাগের মতো। কিন্তু এ-নিয়ে তিনি একদিনের জন্যেও কোনো অভিযোগ করেন নি। তিনি খেতে যেতেন ক্যানটিনে।

"টিকিট? কোত্থেকে পাওয়া যায় বলুন তো?"

"কিনতে হলে ওই জানলায় পাবেন, না হলে আপনাকে অফিস থেকে যোগাড় করে নিতে হবে।" স্বেচ্ছাসেবকটি কিন্তু জানত না যে, সে কার সঙ্গে কথা বলছে।

প্রেমচন্দ্ আর একটিও কথা না বাড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনলেন।

এই লোকটির চরিত্রের মস্ত গুণ ছিল সারল্য।

এবার ঘটনাস্থল লাহোর। সাল 1935। প্রখ্যাত উর্দু নাট্যকার ইমতিয়াজ আলি তাজ প্রেমচন্দকে চায়ের নেমন্তন্নে ডেকেছিলেন। তিনি এককথায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কি কাজের শেষ আছে! সারাদিন লাহোরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে তিনি নাট্যকারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মোটা কাপড়ের জামা। বাড়িটার সামনে একশ'র ওপর মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে, আর গাড়িগুলো কী দারুণ দেখতে! নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, বিচারক, আইনজীবী, অধ্যাপক। এক কথায় শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রেমচন্দকে আগে দেখেন নি, যখন দেখলেন তখন অবাক হয়ে গেলেন।

কী আশ্চর্য! এই সাধাসিধে গাঁইয়া লোকটা কি না বিখ্যাত প্রেমচন্দ! এঁকে দেখার জন্যেই এত লোক এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে!

প্রেমচন্দকে নিয়ে এইরকম অনেক গল্পকথা আছে। সেগুলো শুনলে বোঝা যায় কী সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি অন্য কারও মতো ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর নিজের মতো। আদব-কায়দা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না।

প্রেমচন্দ—1907

2

প্রেমচন্দ নিজের সম্বন্ধে ব'লছেন :

"আমার জীবন একেবারে সাদামাটা সমতলভূমির মতো। সে-জীবনে খানাখন্দ অনেক, কিন্তু পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, গিরি-সঙ্কট, ধ্বংসাবশেষ বলে কিছু নেই। যাঁরা সাফল্যের অনেক বড়-বড় কথা শুনতে চান, তাঁরা আমার জীবনকথা শুনে নিরাশ হবেন।

"আমি জন্মেছি 1880 সালের 31 জুলাই। গ্রামের নাম ছিল লামাহি, গ্রামটি বারাণসী থেকে চার মাইল দূরে। আমার বাবা ছিলেন ডাকবিভাগের একজন কর্মচারী। মা ছিলেন রুগ্ন। আমার একটি বড় বোনও ছিল। আমার জন্মাবার সময় বাবার মাসিক রোজগার ছিল মাত্র কুড়ি টাকা, তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর মাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল চল্লিশে। তিনি খুব চিন্তাশীল প্রকৃতির ছিলেন, সব-সময় চলাফেরা করতেন চোখ খোলা রেখে, কিন্তু শেষ বয়েসে তাঁর মতিভ্রম হয়েছিল, এবং আমিও এর শিকার হয়েছিলাম। যখন আমার মাত্র পনেরো বছর বয়েস, তখন তিনি আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমার বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা মারা যান।"

এসব কথা প্রেমচন্দ এমনভাবে লিখেছেন যে মনে হয় তাঁর ছেলেবেলায় দুঃখের শেষ ছিল না। (তাঁর ছেলেবেলা সত্যিই খুব কষ্টে কেটেছে, কিন্তু তাই বলে কি তা আগাগোড়া দুঃখময় ছিল!) ছেলেবেলা এমনই একটা সময় যখন সব দুঃখকষ্টই উড়িয়ে দেওয়া যায়। ছেলেবেলার স্বপ্ন এবং যাদু সবকিছুই পাল্টে দিতে পারে। ছেলেবেলার ওই যাদু অবশ্য বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যায়। একটি কষ্টের কথা প্রেমচন্দ কখনই ভুলতে পারেন নি, সেটি হল তাঁর মায়ের মৃত্যু। প্রেমচন্দের যখন মাত্র আট বছর বয়েস, তখন তাঁর মা মারা যান। কিছুদিন পরে প্রেমচন্দের বাবা আবার বিয়ে করেন। সৎ-মা প্রেমচন্দের দুঃখ ঘোচাতে পারেন নি, কিন্তু তাই বলে বালক প্রেমচন্দ দিনরাত্তির তার দুঃখকষ্ট নিয়ে মনখারাপ করত না। প্রেমচন্দ নামটি আসলে ছদ্মনাম,

লামাহি—প্রেমচন্দের জন্ম হয় এই গ্রামে
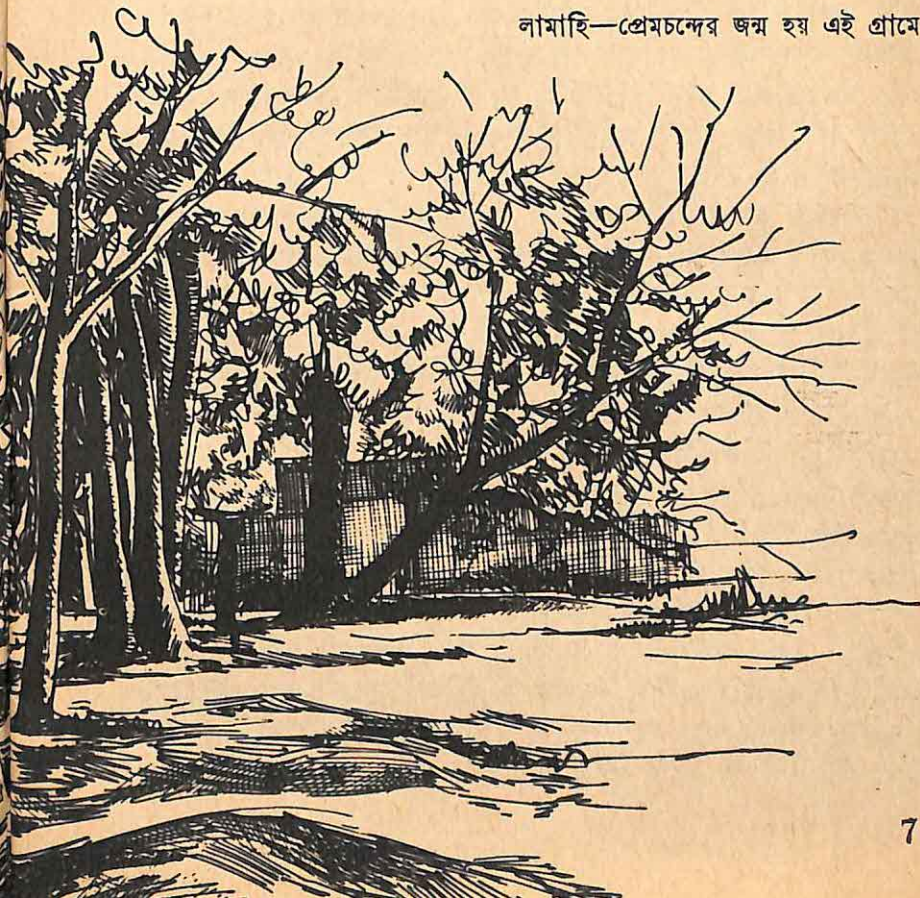
এই নামটি তিনি অনেক পরে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর দুটো নাম ছিল, নবাব আর ধনপত।

তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময় তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি কাছাকাছি একটি গাঁয়ে এক মৌলভির কাছে পড়াশুনো করতে যেতেন। সেই আমলে সেখানে কায়স্থের ছেলেরা যে-ধরনের শিক্ষা পেত সেই ধরনের শিক্ষাই তাঁর জুটেছিল। তখন শিক্ষা বলতে প্রধানত পারসী আর উর্দু ভাষা শেখা বোঝাতো। প্রেমচন্দের স্কুলটা ছিল বেশ মজার। মৌলভির আসল পেশা ছিল দর্জিগিরি করা। তিনি অবসর সময়ে মাদ্রাসা চালাতেন। স্কুলে হাজিরা-খাতার কোনো বালাই ছিল না। কে পড়তে এল, কে এল না, তা নিয়ে মৌলভি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতেন না। মাস গেলে ছাত্রদের মাইনে পকেটে এলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন। ছাত্ররা আবার তাঁর বাড়ির টুকটাক কাজকর্ম করে দিত নিয়মিত। সুতরাং তিনি বেশ সুখেই তাঁর দিন কাটাতেন। নবাব প্রায়ই স্কুল পালাত। (পরদিন নিশ্চয়ই স্কুল কামাই করার একটা চমৎকার অজুহাত দিত।) নবাব স্কুল পালিয়ে সময় কাটাত তোফা আনন্দে। পরবর্তিকালে প্রেমচন্দ আত্মজীবনীমূলক একটি গল্প "চুরি"-তে স্কুল-পালানো-দিনের অনেক মজার-মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

"কখনও আমরা পুলিশ-ফাঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশদের কুচকা-ওয়াজ দেখতাম, কখনও আবার বাঁদরওলা বা ভালুকওলার পেছনে ঘুরে ঘুরেই আমাদের দিন কেটে যেত। আমরা রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেনের যাতায়াতও দেখতাম, স্কুলের রুটিনের চাইতে বোধ হয় ট্রেনের সময়সূচি আমাদের বেশি মুখস্থ থাকত।"

স্রেফ খেলাধুলো করেও সময় কেটে যেত হু হু করে। গ্রামের ছেলেদের খুব প্রিয় ডাংগুলি খেলায় নবাব ছিল এক নম্বরের ওস্তাদ। শুধু খেলাই নয়, গ্রামের বিভিন্ন পুকুর থেকে প্রায়ই মাছ চুরি করে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে নবাব খেত। আখ চুরি কিংবা ঢিল মেরে আম পেড়ে খাওয়াতেও তার জুড়ি ছিল না। (শোনা যায়, দারুণ টিপ ছিল নাকি নবাবের!) শুধু একটা-দুটো নয়, বিনি পয়সায় হরেকরকম মজা করত নবাবরা। সবকিছুই তখন দারুণ মজার ছিল, এমন কি চুরি করার সময় গালাগালি খাওয়াটাও ছিল মজার! সারাদিন টোঁ-টোঁ করে বাইরে ঘুরে বেড়াতে নবাবের খুব ভাল লাগত, কারণ বাড়ির পরিবেশ একেবারেই ভাল ছিল না। মা মারা যাবার পরে বাবা অফিসের কাজকম্ম আর রাগী

সৎ-মাকে নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে থাকত সবসময়। বাড়ির কোনো আকর্ষণ ছিল না নবাবের কাছে। বরং ও অপেক্ষা করত বাবা কবে বদলি হবে! বাবা প্রায়ই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলি হয়ে যেত। বদলির জায়গাগুলো ছিল বান্দা, বাস্তি, আজমগড়, গোরখপুর, কানপুর, লখনউ ইত্যাদি। এইভাবে ঘুরে বেড়াতে নবাবের দারুণ ভাল লাগত। নতুন জায়গায় এসে বাবাও ওকে কিছুটা প্রশ্রয় দিত। সৎ-মা অধিকাংশ সময় থাকত গ্রামের বাড়িতে, সুতরাং নবাবকে বকার কেউ ছিল না। এইসব জায়গার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা প্রেমচন্দ পরবর্তিকালে তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। 'কাজাকী' নামের আত্মজীবনীমূলক একটি গল্পে (এই গল্পে কাজাকী একটি ডাক-পিয়নের নাম) প্রেমচন্দ তাঁর বাবার সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"বাবা খুব চট করে রেগে যেতেন। তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হত, তার ফলে তাঁর স্বভাবটা একটু খিটখিটে-গোছের হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতাম, এবং তিনিও আমাকে খুব-একটা কাছে ডাকতেন না। তিনি খাবার জন্যে সারাদিনে দুবার বাড়িতে আসতেন, এক ঘণ্টা করে থাকতেন। বাকি সময়টা তাঁর কাটত অফিসে। কাজের সুবিধের জন্য তিনি একজন সহকারী চাইতেন প্রায়ই, বড়বাবুরা তাঁর কথায় কান দিতেন না।"

আসলে, বাবা আর ছেলের মধ্যে তেমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি কখনও। মায়ের মৃত্যুর পরে মায়ের মতো স্নেহ-ভালবাসা একজনের কাছ থেকেই পেয়েছিল নবাব, সে ছিল তার বড়দি। সেই বড়দিও বিয়ের পরে একদিন শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। নবাব এবার ভীষণ একা হয়ে গেল। একা নবাব বুনো এবং কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। এর পরের পর্যায় ছিল পুরোপুরি ভবঘুরে হয়ে যাওয়া। ছেলেটি তাই হতে চলেছিল। মাত্র বারো বছর বয়সেই সে বিড়ি খেতে শেখে। প্রেমচন্দ তাঁর ছেলেবেলার এই অধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন, "তখন আমি এমন অনেক কিছু শিখে গিয়েছিলাম যা ওই বয়েসের ছেলের পক্ষে মারাত্মক।" কিন্তু প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে অনেককে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। নবাবের কপাল ভাল বলতে হবে, ও যখন ওর বাবার সঙ্গে গোরখপুরে তখন একজন পুস্তক-বিক্রেতার সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে যায়। তার নাম ছিল বুদ্ধিলাল।

"তখন আমার বয়েস বছর তেরো। আমি হিন্দী জানতাম না। কিন্তু

উর্দু উপন্যাসের পোকা ছিলাম। সে আমলের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকরা ছিলেন মৌলানা শারার, পণ্ডিত রতননাথ শরশার, মির্জা রুসবা, হরদইয়ের মৌলভি মহম্মদ আলি। এঁদের লেখা কোনো বই হাতে এলে আমি ইস্কুলের কথা ভুলে যেতাম। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো দিকে নজর দিতাম না। রেনলডের উপন্যাস তখন খুব চলত। তাঁর বইয়ের বিস্তর উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছিল। তাঁর বইও আমি খুব পড়তাম। ...অবশ্য রতননাথ শরশারের বেশি বই পড়ার সুযোগ আমি পাইনি।... আমি বুদ্ধিলালের দোকানে বসে পছন্দমতো বই টেনে নিয়ে পড়তাম। কিন্তু সারাদিন তো আর দোকানে বসে থাকা যায় না! আমি বুদ্ধিলালের দোকান থেকে ইংরেজী বইয়ের মানে বই, সহায়িকা নিয়ে গিয়ে স্কুলের ছেলেদের কাছে বিক্রি করতাম। এই উপকারের বিনিময়ে আমি বাড়িতে উপন্যাস নিয়ে যাবার সুযোগ পেতাম। আমি এইসময়, দু-তিন বছরের মধ্যে, কয়েক শ উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। উপন্যাসগুলো পড়ার পরে আমি পুরাণের উর্দু অনুবাদ পড়ি। পুরাণের প্রকাশক ছিল নওলকিশোর প্রেস। সে-সময় আমি "তিলিসম-ই-হশরুবা"রও অনেকগুলি খণ্ড পড়েছিলাম। এই বিশাল, চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বইটির সতেরো খণ্ডের অনুবাদ বেরিয়েছিল তখন। এক-একটি বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দু-হাজারের কম হবে না। আর, খণ্ডগুলির আকারও ছিল বেশ বড়। এই সতেরোটি খণ্ডের বাইরে এই বইটির বিভিন্ন উপকাহিনী নিয়ে আরও অনেকগুলি বই বেরিয়েছিল। আমি সব পড়েছিলাম পোগ্রামে। এই বইটি যিনি লিখেছিলেন তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তির কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কথিত আছে, মৌলানা ফৈজী আকবরের জন্য এই গল্পগুলি পারসীতে লিখেছিলেন। এ-কথা কদ্দুর সত্যি আমি জানি না, তবে পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার এ-রকম বিশাল গল্পের বই বোধহয় আর একটিও নেই। বই নয় তো, যেন বিশ্বকোষ! এইধরনের একটি বই কোনো একজনের পক্ষে লেখা অসম্ভব। ষাট বছরের আয়ু নিয়ে এই বইটা যদি কেউ টুকতে শুরু করে, সারাজীবনেও বোধহয় শেষ করতে পারবে না।"

সবাই জানেন, জমিয়ে গল্প লেখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল প্রেমচন্দের। এই গুণটি তিনি ছেলেবেলাতেই অর্জন করেছিলেন। তেরো থেকে পনেরো বছরের পড়াশোনা এই ব্যাপারে তাঁকে খুব সাহায্য করেছিল। পড়াশোনা এবং লেখার আগ্রহ বালক প্রেমচন্দকে একাকীত্ববোধ এবং বাউণ্ডুলেপনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বই-ই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী।

এইসময় নবাব একটি নাটিকা লেখে। এইটিই তার প্রথম সৃষ্টি। নাটিকার বিষয়বস্তু ছিল—দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে নিয়ে একটি বালকের মজা করা এবং প্রতিশোধ নেওয়া। কারণ, ওই আত্মীয়টি ছেলেটিকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। নাটিকার ওই আত্মীয়টি নানারকম অসভ্যতা করার ফল পেয়েছিল হাতেনাতে। ছেলেটিও শোধ তুলেছিল আচ্ছা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এই নাটিকাটি দিনের আলো দেখার সুযোগ পায়নি কখনও। যাই হোক তরুণ লেখকের এটাই ছিল প্রথম সৃষ্টিকর্ম।

নবাবের জীবন ছিল একেবারে একঘেয়ে। পনেরো বছর বয়েসে বিয়ে করার আগে পর্যন্ত তার জীবনে তেমন কিছুই ঘটেনি। বিয়ের ব্যাপারটা প্রথমে বেশ মজার ছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সেটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। রাজযোটক বলতে যা বোঝায়, এ-বিয়ে সে-রকম ছিল না। নবাবের বাবা মারা যান বিয়ের পরের বছরই। প্রেমচন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীমূলক রচনায় লিখেছেন ঃ

"আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। বাড়িতে ছিল বউ, সৎ-মা, আর তাঁর দুটি বাচ্চা। আমাদের রোজগার বলে কিছু ছিল না। সামান্য যা-কিছু পয়সাকড়ি ছিল, বাবার চিকিৎসার পেছনে আর তাঁর সৎকারে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাবা অসুস্থ ছিলেন ছ-মাস। আমার ইচ্ছে ছিল, আমি এম এ পাশ করব, তারপর আইনজীবী হব। এখনকার মতো তখনও চাকরির বাজার ভীষণ খারাপ ছিল। খুব চেষ্টা-চরিত্র করলে মাসিক দশ কি বারো টাকার একটা চাকরি জোটানো যেত তখন। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, পড়াশোনা চালিয়ে যাব। আমার পায়ে তখন যে শেকলটা পরানো ছিল, সেটা শুধু লোহা দিয়ে তৈরি ছিল না, মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত ধাতু একসঙ্গে গালিয়ে সেই শেকলটা বসানো হয়েছিল। আর, আমি চেয়েছিলাম পাহাড়ের মাথায় উঠতে!"

তখন তার জীবন কাটছিল ভীষণ কষ্টে। "এমন একটাও জুতো-জামা ছিল না, যা ছিঁড়ে যায়নি কিংবা ফেটে যায় নি।" সেদিনের কথা প্রসঙ্গে প্রেমচন্দ একটা ছোট প্রবন্ধে লিখেছেন :

"আমি তখন বারাণসীর কুইন্স কলেজের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। হেড-মাস্টারমশাই আমার মাইনে মকুব করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা এসে গিয়েছিল। স্কুল ছুটি হত বিকেল সাড়ে-তিনটেয়, আমি তখন ছাত্র পড়াতে যেতাম। ছাত্রের বাড়ি ছিল 'বাম্‌বু গেটে।' আমি ছাত্রের বাড়ি পৌঁছুতাম

চারটেয়, পড়াতাম ছটা পর্যন্ত। ছাত্রের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি ছিল পাঁচ মাইল। খুব জোরে হাঁটলেও কখনোই রাত্তির আটটার আগে বাড়ি ফিরতে পারতাম না। ওদিকে আবার সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হত, নাহলে সময় মতো স্কুলে পৌঁছুতে পারতাম না। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা ছোট লম্ফের আলোয় পড়তে বসতাম, তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম টের পেতাম না। কষ্টের শেষ ছিল না, কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, একটা-কিছু করতেই হবে।"

বাবা মারা যাবার পরে কষ্ট আরও বেড়ে গেল। বাড়ির অবস্থা এমন হয়েছিল যে, সে-বছরও পরীক্ষায় বসতে পারল না। সুতরাং পরের বছর অর্থাৎ 1898 সালে পরীক্ষায় বসল। পাশ করল দ্বিতীয় বিভাগে। কুইন্স কলেজে পড়বার আশা ছাড়তে হল ওকে, কারণ প্রথম বিভাগে পাশ না করলে ওই কলেজে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। সেই বছরই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল. প্রেমচন্দ ঠিক করলেন, নতুন কলেজেই ভর্তি হবেন। কিন্তু সে আশাও তাঁর পূর্ণ হল না। তখন নিয়ম ছিল, ওই কলেজে ভর্তি হতে গেলে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রেমচন্দ পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। অঙ্কে তিনি খুব কাঁচা ছিলেন। প্রেমচন্দ লিখেছেন, "আমার কাছে অঙ্ক ছিল এভারেস্ট শৃঙ্গের মতো। আমি সেই শৃঙ্গে কখনোই পৌঁছুতে পারিনি।" অঙ্কে কাঁচা থাকার দরুন শুধু যে হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়া আটকাল তাই নয়, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করতেই তাঁর বহুবছর লেগে গেল। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে দুবার ফেল করে তিনি সব আশা ছেড়ে দিলেন। পরে যখন নতুন নিয়ম-কানুন হল, তিনি অঙ্কের বদলে অন্য বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দিলেন। 1916 সালে, অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ করার আঠারো বছর পরে, তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করলেন।

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে না পেরে প্রেমচন্দ ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে পড়াশোনার আগ্রহে তাঁর ভাটা পড়ল না।

"বাড়ি বসে থেকে কী করব ? কীভাবে অঙ্ক শেখা যায়, আর কীভাবে কলেজে ভর্তি হওয়া যায়. এই ছিল তখন আমার সমস্যা। এই সমস্যা দূর করতে হলে আমাকে শহরে গিয়ে থাকতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় আমি এক উকিলের ছেলেদের পড়াবার চাকরি পেলাম। মাইনে মাসে পাঁচ টাকা। ঠিক করলাম, দু টাকায় নিজের খরচ চালাব, আর তিন

টাকা পাঠাব বাড়িতে। উকিলবাবুর আস্তাবলের মাথায় মাটির তৈরি একটা ছোট ঘর ছিল। আমি সেখানে থাকার অনুমতি পেলাম। এক টুকরো চট বিছিয়ে আমার বিছানা তৈরি হল। বাজার থেকে ছোট্ট একটা লণ্ঠন কিনে নিয়ে এলাম। শুরু হল আমার শহরের জীবন। শহরে আসার সময় আমি বাড়ি থেকে মাটির হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে এসেছিলাম। দিনে রান্না করতাম একবার। খেয়ে দেয়ে বাসন-পত্তর ধুয়ে লাইব্রেরিতে পড়তে যেতাম। অঙ্ক শেখা ছিল নেহাতই অজুহাত, উপন্যাস পড়েই আমার অধিকাংশ সময় কেটে যেত। তখন আমি পণ্ডিত রতননাথ ধরের 'ফসানা-ই-আজাদ' (আজাদের রোমান্স) এবং 'চন্দ্রকান্ত সনতাতি' (চন্দ্রকান্তের উত্তরপুরুষ) পড়েছিলাম। উর্দু ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে-সব বই অনূদিত হয়েছিল, সে-সবও পড়েছিলাম।"

ছাত্রজীবনে দারিদ্র্যের হাত থেকে তিনি কিন্তু কখনোই মুক্তি পেলেন না :

"সেবার শীতে আমার কাছে একটা পয়সাও অবশিষ্ট ছিল না। এক পয়সায় যা জোটে তাই খেয়ে সারাদিন কাটাতাম, এইভাবে কয়েদিন কাটাবার পরে সব পয়সা ফুরিয়ে গেল। মনে পড়ে না ঠিক কী করেছিলাম তখন, হয় ধার চেয়ে পাইনি, কিংবা চাইতেই আমার লজ্জা করেছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় 'চক্রবর্তীর অঙ্ক-সহায়িকা'-র ইংরাজী সংস্করণ বিক্রি করার জন্যে এক বইয়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম।

বইটা আমি দুবছর আগে কিনেছিলাম। অনেক কষ্টের মধ্যেও বইটা আমি হাতছাড়া করিনি, কিন্তু আজ আর পারলাম না। বইটা কিনতে লেগেছিল দু টাকা, কিন্তু বিক্রি করতে হল এক টাকায়। টাকাটা নিয়ে দোকান থেকে যেই না বেরোব অমনি এক ঝাঁকড়া গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে ডাকলেন। ভদ্রলোক দোকানেই বসেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পড় তুমি ?'

'কোথাও না, তবে ইচ্ছে আছে কোথাও ভর্তি হয়ে যাব।'

'ম্যাট্রিক পাশ করেছ ? চাকরি করতে চাও ?'

'চাই, কিন্তু পাচ্ছি না।"

"এই ভদ্রলোক ছিলেন এক ছোট্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ইনি একজন সহকারী শিক্ষক খুঁজছিলেন। তিনি আমাকে চাকরিটা দিতে চাইলেন, বেতন মাসে আঠারো টাকা। আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। সে-সময় আঠারো টাকার চাকরি পাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারতাম

না। পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে বাড়ি ফিরে এলাম। এই ঘটনাটি ঘটেছিল 1899 সালে। তখন আমি যে-কোনো অবস্থার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ছিলাম। অঙ্কই আমার পথ আটকে দিয়েছিল, না আটকালে আমি নির্ঘাত অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারতাম। বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছাত্রদের অবস্থা ঠিক বুঝতে চাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মনোভাব শুধু তখন নয়, পরেও বেশ কয়েক বছর ছিল। ছাত্ররা ছিল অপরাধীর মতো, লম্বা হও আর বেঁটে হও, সবার জন্যে এক মাপের বিছানা।”

3

বারাণসী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে চুনার। জায়গাটি ছোট-খাট আর নিরিবিলি। এখানে একটি পুরনো দুর্গ ছিল, আর ছিল একটি ব্রিটিশ সেনাদল। প্রেমচন্দ চাকরিতে ঢুকে পড়লেন। তাঁর সেই দুঃখের দিনে এই চাকরি পাওয়ার ঘটনাটি ছিল বিরাট।

শুরু হল প্রেমচন্দের স্কুল-শিক্ষকের জীবন। এই পেশাতেই তাঁর জীবনের পরবর্তী বাইশ বছর কেটে গেল।

শিক্ষকতার জীবনও ক্রমশ হয়ে উঠল একঘেয়ে। স্কুল ছুটি হবার পরে তাঁর হাতে সময় থাকত প্রচুর, কিন্তু তেমন-কিছু করার ছিল না। অবশ্য, অবসর তাঁকে চেপে ধরেনি কখনও, সময় পেলেই তিনি বইপত্তর পড়তেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার নাম হয়ে গেল 'বইয়ের পোকা'। কিন্তু এই বইয়ের পোকাই একদিন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল। উপলক্ষ্য ছিল স্কুলদল বনাম সেনাদলের ফুটবল ম্যাচ। স্কুলের ছেলেরা তাদের দলকে জেতাবার জন্যে খেলা শুরু হবার পর থেকেই খুব চেঁচাতে শুরু করে দিল। এবং শেষ পর্যন্ত স্কুলদল জিতেও গেল। স্কুলের ছেলেদের হিপ-হিপ-হুররেতে কানা তালা লাগার উপক্রম। ওদের আনন্দ-উল্লাসে সেনাদল হঠাৎ ক্ষেপে গেল। হঠাৎ সেনাদলের একজন ছুটে এসে স্কুল টিমের একজনকে বেধড়ক লাথি মারতে শুরু করে দিল। এই ধরনের মারামারি ফুটবল-মাঠে বোধ হয় খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রেমচন্দ এই ঘটনাটিকে কোনোমতেই মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বোধ হয় এই ঘটনাটির মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্য দেখতে পেয়েছিলেন। একজন শ্বেতাঙ্গকে কি এইভাবে লাথি মারা যেত? ভাবতেই তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তিনি খেলার মাঠের সীমান্ত থেকে একটা পোস্ট তুলে নিয়ে সেনাদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর সে কি মার! স্কুলের ছেলেরাও তার সঙ্গে যোগ দিল। গোরা সৈন্যরা সেদিনের মারের কথা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলতে পারেনি।

গোলমাল মিটে যাবার পরে সবাই অবাক। আরে, এই ঠাণ্ডা, ভাল-মানুষ, বইয়ের পোকাটিই শেষ পর্যন্ত এত বড় একটা ব্যাপারে নেতৃত্ব

দিল! কে জানত, তাঁর ভেতরে এত আগুন আছে! অবশ্য, ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু যেখানে জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন জড়িত, কিংবা যেখানে সামাজিক ন্যায়নীতি লজ্ঘিত হচ্ছে, সেখানে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তিনি সমস্ত অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন, এবং নির্ভয়ে এগিয়ে যাবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাঁকে এইরকম একটি পরীক্ষার সামনে এসে দাঁড়াতে হল। ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর এক সহকর্মী মৌলভি ইবনে আলীকে নিয়ে। মৌলভি স্কুল কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়েছিলেন।

প্রেমচন্দ আগের মতোই কোনোরকমে দিন কাটাচ্ছিলেন। আঠারো টাকা এমন-কিছু একটা টাকা নয়, ওই টাকা দিয়েই আবার দেশের সংসার চালাতে হত। সুতরাং বলা যেতে পারে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপই ছিল। সংসার চালাতে গিয়ে কিছুদিন আগে তাঁর একমাত্র গরম কোটটা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল। যাইহোক, এই চাকরিটাই ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। ভবিষ্যৎ বলেও তাঁর কিছু ছিল না। এইসব কারণে তাঁকে একটু সতর্ক হয়ে চলতে হত। কিন্তু স্কুল-কর্তৃপক্ষ যখন মৌলভির ওপর অবিচার করল তখন প্রেমচন্দ তাঁর ভবিষ্যতের কথা একবারও না ভেবে প্রতিবাদ করে বসলেন। এর ফলে কর্তৃপক্ষ প্রেমচন্দের ওপরেও খুব চটে গেল, এবং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রেমচন্দের চাকরি গেল। আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

তবে তাঁর কপাল ভাল বলতে হবে, তিনি এইসময় কুইন্স কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্টার বেকনের অনুগ্রহ লাভ করলেন। এই তরুণ মেধাবী ছেলেটিকে বেকন সাহেবের ভাল লেগে গেল। শিক্ষা দফতরে সাহেবের হাত ছিল, তাঁরই চেষ্টায় বহরিকের সরকারী স্কুলে প্রেমচন্দ পঞ্চম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন।

এইসময় থেকে শুরু করে 1921 সাল পর্যন্ত প্রেমচন্দ বিভিন্ন জায়গার সরকারী স্কুলে চাকরি করেন। জায়গাগুলির নাম ছিল প্রতাপগড়, এলাহাবাদ, কানপুর, হামীরপুর, বস্‌তি এবং গোরখপুর। দু-তিন বছর পরে পরেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলি হতেন। অনবরত বদলি তার শরীরের পক্ষে ভাল ছিল না, কিন্তু একজন লেখক হিসেবে এর ফলে তিনি উপকৃত হয়েছিলেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একজন লেখকের মূলধন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যজীবনে খুব কাজে এসেছে। যেদিন একজন লেখকের অভিজ্ঞতার পুঁজি ফুরিয়ে যায়, সেদিন
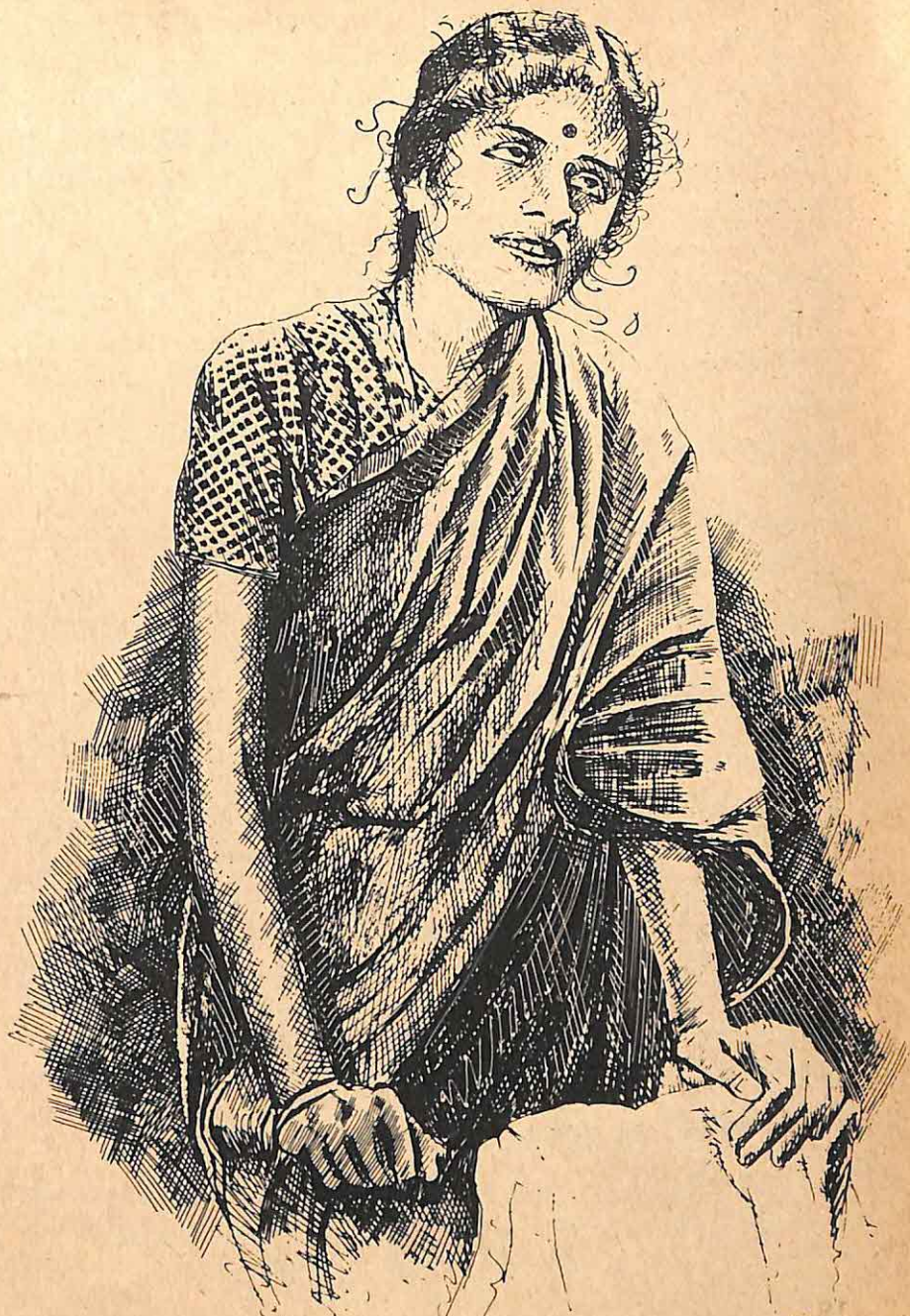
শুভলক্ষ্মী—প্রেমচন্দের 'সেবাসদনে'র তামিল ভাষার অভিনয় করা প্রখ্যাত গায়িকা।

সেই লেখকও ফুরিয়ে যায়। প্রেমচন্দের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তিনি খুব দুঃখকষ্টে দিন কাটিয়েছেন সত্যি, কিন্তু এই জীবন তাঁকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে প্রচুর, যা তাঁর লেখকজীবনে কাজে লেগেছে। প্রেমচন্দ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছিলেন, রোজকার খাওয়াপরার চিন্তাও দূর হয়েছিল। এইভাবেই তাঁর লেখকজীবনের আদর্শক্ষেত্র তৈরি হয়।

তিনি মনোযোগ দিয়ে লিখতে শুরু করলেন 1900 সাল নাগাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর প্রথম জীবনের অনেক লেখাই নষ্ট হয়ে গেছে। এইসময় তিনি উর্দুতে একটি ছোট উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। উপন্যাসটির নাম ছিল 'আসরার-ঈ-মাবিদ' (মন্দিরের রহস্য)। অসমাপ্ত এই উপন্যাসটি বারাণসীর একটি অখ্যাত সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশকাল—1903 সালের শেষ থেকে 1905 সালের শুরু পর্যন্ত। উপন্যাসটি মন্দিরের এক মোহান্তের জীবনকথা নিয়ে রচিত। পুরনো রোমান্স রচনার ভঙ্গিতে উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। ছেলেবেলায় তিনি রোমান্স পড়েছিলেন বিস্তর। অবশ্য উপন্যাস রচনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি শুধু বিনোদনের জন্যে লিখতেন না, তিনি চাইতেন তাঁর পাঠকরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। সৃজনধর্মী সাহিত্য পাঠককে শিক্ষিত করে তোলে। এইসময় তিনি একটু বড় আকারের একটি উপন্যাস লেখেন। 'হম খুরমা ও হাম সওয়াব' হিন্দীতে অনূদিত হয়ে 'প্রেমা' নামে প্রকাশিত হয় 1907 সালে। বাল্যবিধবাদের দুঃখের কত কাহিনী আছে। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে এইসব বিধবারা নানারকম কঠিন আচার-বিচার মেনে সারাজীবন নিঃসঙ্গ কাটাতে বাধ্য হয়। 'প্রেমা'য় একটি বাল্যবিধবার জীবনকথা লেখা। উপন্যাসের আদর্শবাদী নায়ক তাকে বিয়ে করে। প্রেমচন্দ বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন মনেপ্রাণে। এটি তাঁর কাছে বাইরের ব্যাপার ছিল না। অনুরূপ একটি ঘটনা তাঁর নিজের জীবনেও ঘটল। প্রেমচন্দের বিবাহিত জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবার পরে তিনি 1906 সালে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। এই মেয়েটি ছিল বাল্যবিধবা, নাম শিবরানী দেবী। শিবরানী দেবী ছ'টি সন্তানের জননী হন। এই ছজনের তিনজন আজও বেঁচে আছে।

4

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বাল গঙ্গাধর তিলকই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি গণ-জাগরণ এবং গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশে স্বাধীনতা আনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়-আন্দোলন প্রধানতঃ আলোচনা ও পরামর্শের মধ্যে সীমিত ছিল। দেশের প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশ নেবার কথাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। আলোচনা চলত কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজের। ব্রিটিশ সরকার 1908 সালে তাঁকে গ্রেফতার করে এবং মান্দালয়ে পাঠিয়ে দেয়। তিলকের চিন্তা-ধারায় প্রেমচন্দ ভীষণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তখন বাংলায় চলছিল স্বদেশী আন্দোলন, এই আন্দোলনও প্রেমচন্দকে যথেষ্ট প্রেরণা দেয়। তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। কার্জনের বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন থেকেই বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির জন্ম হয়। এই সমিতিগুলি আস্তে আস্তে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই সমিতিগুলি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবে নেমেছিল। বিপ্লবীরা মৃত্যুকে ভয় পেত না, দেশের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিল। এঁদের কার্যকলাপ দেশের বহু মানুষের কল্পনাকে সুদূরপ্রসারী করেছিল। তরুণ প্রেমচন্দ ছিলেন এইসব মানুষের একজন। তাঁর এইসময়ের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছিল ইতালীর গ্যারিবল্ডি ও ম্যাৎসিনির জীবনী। বিবেকানন্দের জীবনীও তিনি লিখেছিলেন। বিবেকানন্দ ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয়দের দিকে পশ্চিমের চোখ ফিরিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন নতুন ধরনের স্বামী, বিপ্লবী স্বামী। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর বাণী আজকের মতো সেদিনও ছিল মূল্যবান। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীর এক জায়গায় প্রেমচন্দ তাঁর বাণী উদ্ধৃত করেছেন।

"আমার তরুণ বন্ধুরা, শক্তিশালী হও। তোমাদের কাছে এটাই আমার একমাত্র উপদেশ। তোমরা গীতা পড়ার বদলে ফুটবল খেলে অনেক সহজে স্বাধীনতা অর্জন করতে পার। তোমাদের পেশী সবল ও শক্তিশালী হলে তোমরা গীতার বাণী অনেক ভালভাবে বুঝতে পারবে।

গীতার বাণী ভীরুদের জন্য রচিত হয়নি, রচিত হয়েছে অর্জুনের জন্য। অর্জুন ছিলেন শক্তিশালী এবং সাহসী।”

এই সময় প্রেমচন্দ বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পগুলির বিষয় স্বদেশপ্রেম। এই পর্যায়ের প্রথম গল্প 'অমূল্য রত্ন'। সেকালে রোমান্স লেখা হত যে ভঙ্গিতে সেই ভঙ্গিতে গল্পটি লেখা, কিন্তু গল্পের শেষে তিনি একটি নতুন কথা শুনিয়েছিলেন। নতুন কথাটি হল, মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যে রক্তপাত হয় সেটাই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই গল্পটি এবং এইরকম আরও কয়েকটি গল্প নিয়ে প্রেমচন্দের একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। সংকলনের নাম 'সজ-ঈ-ওতান', (মাতৃভূমির দুঃখ)। বইটি প্রকাশিত হয় 1909 সালে। প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে বইটির ওপর। গ্রন্থকারের নাম ছিল নবাব রাই। এই নামের আড়ালে যিনি ছিলেন তাঁকে খুঁজে বার করতে সরকারের দেরি হল না। তারপরেই শুরু হল ঝামেলা।

“তখন আমি হামীরপুর জেলায় শিক্ষা দফতরে সহকারী পরিদর্শকের পদে ছিলাম। ঐ গল্পের বইটি ছ'মাস হল বেরিয়েছে। একদিন সন্ধ্যে-বেলায় তাঁবুতে বসে আছি, হঠাৎ শমন এসে হাজির, জেলা কালেক্টরের সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করতে হবে। কালেক্টর শীতকালীন সফরে বেরিয়েছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা গরুর গাড়িতে চড়ে রওনা হয়ে গেলাম। কালেক্টরের ডেরা ওখান থেকে তিরিশ কি চল্লিশ মাইল দূরে। সারারাত গরুর গাড়িতে কাটিয়ে পরদিন পৌঁছুলাম। কালেক্টরের সামনে আমার একখানা বই পড়েছিল। দেখেই তো আমার মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দিল। তখন আমি নবাব রাই নামেই লিখতাম। খবর পেয়ে-ছিলাম, গেয়েন্দা পুলিশ ঐ বইয়ের লেখককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, ওরা আমাকে চিনে ফেলেছে। এবার আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'বইটা কি তোমার লেখা?' কালেক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'হ্যাঁ আমিই লিখেছি।'

“তিনি তখন আমার কাছে প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু জানতে চাইলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'তোমার প্রতিটি গল্পেই রাজদ্রোহ আছে। তোমার কপাল ভাল যে তুমি ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করছ। এটা যদি মুঘল আমল হত তোমার দুটো হাতই কেটে নেওয়া হত।'

"বিচার শেষ, তিনি এবার রায় দিলেন—আমি যেন আমার বইয়ের সমস্ত কপি সরকারের কাছে জমা করে দিই। আর, কালেক্টটরের অনুমতি না নিয়ে কক্ষনো যেন কিছু না লিখি। আমি সে যাত্রা খুব অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম।"

একদিক দিয়ে তিনি সত্যিই সেবার বেচে গিয়েছিলেন। কিন্তু কালেক্টরের অনুমতি না নিয়ে কিছু লেখা যাবে না, এটা কেমন করে সম্ভব! নবাব রাই ঐ শর্ত মানতে একেবারেই রাজী ছিলেন না। সুতরাং তিনি তাঁর ঐ নাম পাল্টে প্রেমচন্দ নামে আগের মতোই লিখতে শুরু করলেন। এই শান্ত মানুষটির ভেতরে আগুন ছিল। ব্রিটিশ রাজের কড়া শাসন তিনি মানলেন না। তিনি চোদ্দ বছরের বালক ক্ষুদিরাম বোসের একটি ছবি সংগ্রহ করে তাঁর বাড়ির দেয়ালে ভালভাবে টাঙিয়ে রাখলেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল কিছুদিন আগেই।

1905-21—এই কয়েকটি বছর ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় নেতা হিসেবে তিলকের আবির্ভাব।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন (1905)।

বোমা-বন্দুক হাতে গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ।

মিন্টো-মর্লে সংস্কার (1909)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-18)।

সোভিয়েত বিপ্লব (1917)।

1918 সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। গান্ধীজী সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ব্রিটিশ সেনাদলের জন্য সৈন্য সংগ্রহে নেমেছিলেন। প্রতিদানে ব্রিটিশ নিয়েছিল দুমুখো নীতি। একটি হল মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (1918), অপরটি হল জালিয়নওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড (1919)।

1921 সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

এই সময়টি ছিল সত্যিই খুব ঘটনাবহুল। এই সময় প্রেমচন্দের কেটেছে উত্তর প্রদেশের ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামে। অনেক সময় তিনি এমন জায়গায় ছিলেন যেখান থেকে রেল স্টেশন ছিল অনেক দূরে। কিন্তু তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন যাতে পৃথিবী থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন। প্রেমচন্দ ছিলেন খবরের কাগজের একজন মনোযোগী পাঠক। তিনি দূর প্রান্তে থাকলেও নিয়মিত খবরের কাগজ যোগাড়

করতেন। কাগজ হাতে পেতে অবশ্য দেরি হত। খবরাখবর রাখতেন বলেই দেশের এবং বিদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিত তাঁর মধ্যে চট করে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া এ দেশের যে ক'জন মানুষের মধ্যে প্রথম দেখা গিয়েছিল, প্রেমচন্দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খবর চেপে যাওয়া সত্ত্বেও, ঐ বিপ্লবের সমর্থন পাওয়া যায় প্রেমচন্দের 'গোসা-ঈ-আফিয়াত' উপন্যাসে। উর্দু ভাষায় রচিত উপন্যাসটি পরে প্রেমশর্মা নামে হিন্দীতে অনূদিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ঘটে যাবার মাস ছয়েকের মধ্যেই রচিত। 1921 সালের 21 ডিসেম্বর বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে প্রেমচন্দ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড-সংস্কার পরিকল্পনারও নিন্দা করেছিলেন।

"...সংস্কারের একমাত্র ভাল দিক ছিল যে, এর ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাবে। কিন্তু এর ফলে এমন কয়েকটি অবস্থার সৃষ্টি হবে, যার ফলে তারা গরিব লোকের গলাকাটার সুযোগ পাবে ভাল ভাবে। এই প্রথাটাই এতদিন অন্যভাবে চলছিল, উকিল সেজে তারা গরিবদের রক্ত চুষছিল।"

প্রেমচন্দ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলছিলেন, কিংবা বলা যেতে পারে তিনি সময়ের এক ধাপ কি দু ধাপ আগে ছিলেন। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভেঙে পড়েছিল। আমাশয়ে ভুগে ভুগে তিনি একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি হেরে যাবার লোক ছিলেন না। জাতীয় অভ্যুত্থানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন। বিশ্রাম নিতে জানতেন না একদম। সারাদিন স্কুলে হাড়ভাঙা খাটনির পরে তিনি রাত জেগে লিখতেন। কখনও কখনও (স্ত্রীর শাসন এড়াবার জন্যে) ভোর-রাত্তিরে উঠে আলো জ্বালিয়ে সকাল পর্যন্ত লিখতেন। তারপরে বাড়ির কিছু কাজকর্ম সেরে স্কুলে ছুটতেন। তিনি প্রচুর কাজকর্ম করতেন, কিন্তু তাঁকে বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। তিনি তাঁর লেখাপত্র নিয়ে বাইরে হৈ-চৈ করতেন না একদম। সত্যিকারের কাজের লোক ছিলেন তিনি, এবং সব কিছুর জন্যেই তাঁর সময় ভাগ করা থাকত। কাজকর্ম করার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল তাঁর। একজন কৃষকের রোজ সকালে গরু-লাঙল নিয়ে মাঠে চাষ করতে যাবার মতো নিয়ে তিনিও কাজ করতেন প্রতিদিন। তাঁর মধ্যে কোনোরকম ভাণ ছিল না। তিনি 'লেখার মুড' নামক মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সৃজনমূলক কর্মের প্রেরণা কঠিন বস্তু দিয়ে তৈরি
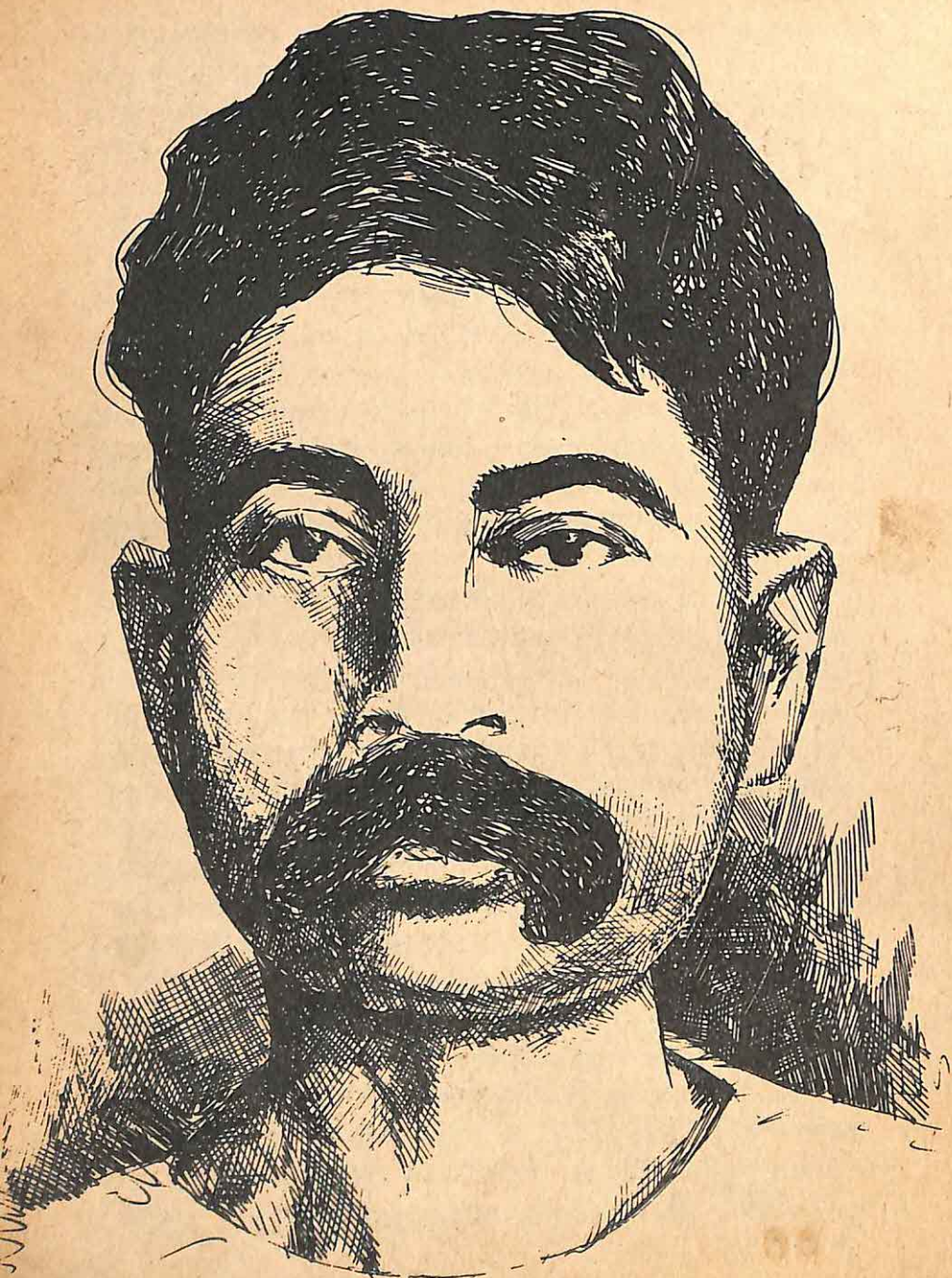
চল্লিশ বছর বয়সে প্রেমচন্দ

ছিল। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়। তিনি যখন-তখন যেখানে-সেখানে বসে লিখতে পারতেন। তিনি তাঁর মনের ওপর প্রভুত্ব করতেন, তাঁর মনের দাসত্ব করতেন না। এই বোধ সম্ভবত দেশ ও দশের জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব থেকে গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ও দেশীয় শোষকদের দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষাও এই বোধ নির্মাণে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

তাঁর আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল যে, মনে হতে পারে, তিনি নিজেকে স্বাধীনতা-যুদ্ধের একজন সৈনিক ভাবতেন। তাঁর হাতে রাইফেলের বদলে কলম ছিল। নানা অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও তিনি এই-সময় অসংখ্য ছোটগল্প, এবং ছোট-বড় মিলিয়ে দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। টলস্টয়ের 'নীতিকথা ও গল্পের' অনুবাদ করেছিলেন। সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে এমন কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যাতে জনগণের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা ছিল। জাতীয় আন্দোলন কর্তৃক স্বাধীনতা ও বাস্তবতার প্রকৃত অর্থ প্রচার শুরু হওয়ার আগেই এই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল। এইসময় রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ছিল 'জলবা-ঈ-ঈশার' বা 'বরদান'। এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' অনুসরণে। একজন স্বদেশপ্রেমী স্বামী এই উপন্যাসের নায়ক। 'বাজার-ঈ-হুশন' বা 'সেবাসদন' পতিতাবৃত্তির সামাজিক কুফল নিয়ে লেখা। 'গোসা-ঈ-আফিয়াত' বা 'প্রেমশর্মা' সমাজের আর একটি অসুখ নিয়ে লেখা। এই অসুখটির নাম জোতদারি। জোতদাররা জমিচাষ করে না, কিন্তু ওরাই জমির মালিক। এরা জোঁকের মত চাষীর রক্ত চুষে খায়। এই অসুখ সারাবার জন্যে যে-সব বিধি তিনি দিয়েছিলেন, আজকের একজন পাঠকের কাছে সেগুলো হয়ত নেহাতই আদর্শবাদী বুলি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে প্রেমচন্দ এই কথাগুলো ভাবতে পেরেছিলেন। এই কথাগুলো তাঁর নানা গল্প এবং উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। তখনকার এই লেখাগুলি ছিল মূলত রোম্যান্টিক ইতিবৃত্ত, কিন্তু পরবর্তিকালে প্রেমচন্দ ওই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন। তিনি উর্দু এবং হিন্দীতে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন।

5

তখন কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন গান্ধীজী। সারাদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি জনগণকে আসন্ন সংগ্রামের জন্য তৈরি করছিলেন। তিনি গোরখপুর গিয়েছিলেন 1921 সালের 8 ফেব্রুয়ারি। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও একটি জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা দেন। প্রেমচন্দের চাকরি করতে আর ভাল লাগছিল না। তিনি ভাবছিলেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবেন। কয়েক মাস আগে থেকেই অবশ্য তিনি বেসরকারী চাকরির খোঁজে বন্ধুদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন নিয়মিত। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চাইছিলেন না। এই অসন্তোষ এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তিনি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেবার কথা ভাবছিলেন। শোনা যায়, ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে এইসময় তাঁর দুটি সংঘর্ষ হয়েছিল।

প্রথম সংঘর্ষটি হয়েছিল একটা গরু নিয়ে জেলার হাকিমের সঙ্গে। গরুটা ছিল প্রেমচন্দের, গরুটা কীভাবে যেন ঢুকে পড়েছিল হাকিমের বাগানে। হাকিম তো চটে লাল। বলল, গরুটাকে গুলি করে মারবে। খবর শুনে প্রেমচন্দ ছুটে এলেন হাকিমের কাছে। প্রেমচন্দ খুব বিনীত ভঙ্গিতে কথা শুরু করলেন, কিন্তু তাঁর কথা শুনে হাকিমের রাগ ঠাণ্ডা হল না। প্রেমচন্দ এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চটে গিয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে গরুটাকে গুলি করো, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা!

দ্বিতীয় সংঘর্ষটি হয়েছিল শিক্ষা দফতরের একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে। সাহেব প্রেমচন্দের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় প্রায়ই দেখতেন, প্রেমচন্দ বারান্দায় বসে আছে। রাজার জাত সাহেব এটা কোনোমতেই সহ্য করতে পারেনি। সে চাইত, তাকে দেখলেই প্রেমচন্দ উঠে এসে সেলাম ঠুকবে।

প্রেমচন্দ একদিনও তা করেননি, উল্টে বলেছিলেন, "স্কুলের কাজকর্ম মিটে যাবার পরে আমি কারও গোলাম নই।"

এইরকমের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল তাঁর জীবনে। তিনি

পত্নী শিবরানী দেবী

চাকরি ছাড়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু চাকরি ছাড়া তো সহজ কথা নয়। এইসময় তাঁর এক ছেলে বসন্তরোগে মারা যায়। তাঁর মন ভেঙে যায় একদম। ভবিষ্যৎ-সংস্থান বলে তাঁর কিছু ছিল না। দুটি সন্তান এবং স্ত্রী নিয়ে কী করে দুম করে চাকরি ছেড়ে দেবেন! চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই খুব কঠিন ছিল সেইসময়। বাইশ বছরের চাকরি, চাকরির শেষে পেনসন—কিন্তু এক সপ্তাহ গভীরভাবে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন জেদীগোছের কৃষক রমণী, তিনিও সম্ভবত তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিলেন।

চাকরি ছেড়ে প্রেমচন্দ পথে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর তখন এমন অবস্থা যে, ও-বেলার খাওয়া কোত্থেকে জুটবে জানতেন না। প্রেমচন্দ একটি খাদি-ভাণ্ডার খুললেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেলেন যে, তাকে দিয়ে এ-কাজ চলবে না। তিনি তখন স্থানীয় একটি পত্রিকায় সম্পাদকের চাকরির চেষ্টা করলেন, কিন্তু পেলেন না। গোরখপুরে থেকে আর কী করবেন, ফিরে এলেন বারাণসীতে। সেখানে একটি হিন্দী পত্রিকায় সম্পাদকের চাকরি পেলেন। পত্রিকাটির নাম 'মর্যাদা'। কয়েকমাস এই কাজ করার পরে কাশী বিদ্যাপীঠের স্কুলবিভাগে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন। কিন্তু এই চাকরিও তাঁর বেশিদিন টিঁকল না। তিনি একটি মাড়োয়াড়ি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে চলে গেলেন কানপুরে। এই স্কুলে তাঁর চাকরির মেয়াদ ছিল বছরখানেক।

1923 সাল নাগাদ প্রেমচন্দ ঠিক করলেন, দেশের বাড়িতে গিয়ে নিরিবিলিতে বাকি জীবনটা কাটাবেন। আর, গ্রাম থেকে মাইল চারেক দূরে শহরে একটি প্রেস এবং একটি ছোট পুস্তক-প্রকাশন সংস্থা খুলবেন। এই পরিকল্পনাটি তাঁর মাথায় এসেছিল 1916 সাল নাগাদ গণেশশংকর বিদ্যার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ হবার পরে। এই বিখ্যাত ব্যক্তিটির সম্পর্কে আমরা সত্যিই খুব কম জানি। তাঁর সম্পর্কে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। আসলে এটি ছিল তাঁর জীবনের অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-সব প্রখ্যাত ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অসমসাহসী এবং সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁর কাছাকাছি যারা এসেছে, তারা সকলেই তাঁর আদর্শে

প্রেমচন্দ—1924

অনুপ্রাণিত হয়েছে। তিনি একটি প্রেস খুলেছিলেন, নাম ছিল প্রতাপ প্রেস। এই প্রেসটির একটি প্রকাশন-সংস্থা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রকাশন-সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। প্রেমচন্দ হয়ত এই কর্মকাণ্ড থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। অনুরূপ কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই জাতীয় কাজে

নামতে গেলে দুটি জিনিসের ভীষণ দরকার। একটি হল মূলধন, অপরটি ব্যবসা-বুদ্ধি। এই দুটির কোনোটিই ছিল না প্রেমচন্দের। ফলে, তাঁর প্রেস এবং প্রকাশন-সংস্থা তাঁর কাঁধে মস্ত বোঝা হয়ে চেপে বসল। চারদিকেই অচল অবস্থা, বাধ্য হয়ে আবার তিনি চাকরি খুঁজতে শুরু করলেন। এবার তিনি লখনউতে 'মাধুরী' পত্রিকার সম্পাদকের চাকরি পেলেন। কিন্তু এই কাজে তাঁর সহকারী বলে কেউ ছিল না। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে তাঁকে অফিসের পাঁচরকম কাজকর্মও করতে হত। এই কাজকর্মের একটি ছিল পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা। কাজকর্মের এত চাপ ছিল যে, তিনি মাথা তোলার সময় পর্যন্ত পেতেন না। তিনি ছিলেন, যাকে বলে, "রেসের ঘোড়া, হয়ে গেলেন ভারবাহী অশ্ব।"

এইসমস্ত কাজ তাঁর এত ক্লান্তিকর ঠেকছিল যে, তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন ঠিক করলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বারাণসীর প্রকাশন-সংস্থা থেকে 'হংস' নামে একটি পত্রিকা বার করতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং সেই বারাণসীতেই আবার ফিরে গেলেন। সেটা ছিল 1932 সালের মে মাস। ছ বছর আগের সেই অপূর্ণ স্বপ্নগুলি আবার দেখতে শুরু করলেন তিনি।

আবার সেই আগের দশা। তিনি কিন্তু একটুও ভেঙে পড়লেন না। এটাই বোধ হয় তাঁর জীবনযাত্রা পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। বেশ কয়েকবছর পরে আবার এইসময় জাতীয় আন্দোলনে জোয়ার দেখা দেয়। কর্তব্যের ডাক এলে কোনো কিছুতেই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। 'হংস' নিয়ে তাঁর মাথাব্যাথার শেষ ছিল না, কিন্তু এই সময়ই তিনি আর একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবলেন। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির নাম ছিল 'জাগরণ'। এই পত্রিকাটি চালাবার মতো যথেষ্ট পয়সাকড়ি তাঁর হাতে ছিল না। ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট হিসেব করে চলতেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বড়-বড় ব্যাপারে তিনি কোনো হিসেবের ধার ধারতেন না। দেশের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, বেপরোয়া মনোভাব বোধ হয় এর থেকেই এসেছিল। এইভাবেই হয়ত জীবনে সত্যিকারের বড় কাজ করা যায়। ভালমন্দ নিয়ে চুলচেরা বিচার করা একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেই মানায়, জীবনে সে যতই সাফল্য পাক না কেন, তার ক্ষুদ্রতা কখনই ঘোচে না।

ঐ প্রেস নিয়ে অসংখ্য ঝক্কিঝামেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কখনও হয়ত কর্মীদের মাইনে দেবার পয়সা থাকে না, কখনও আবার কাগজ-ওয়ালার টাকা বাকি পড়ে যায়। কিন্তু, এতসব ঝামেলাতেও প্রেমচন্দের মনোবল ভেঙে পড়েনি। তিনি শান্তিতে ছিলেন। এই শান্তি ছিল তাঁর মনের শান্তি। শান্তি ছিল বলেই সৃষ্টিমূলক কাজে তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। তিনি নিয়মিত লিখছিলেন। লখনউতে অত কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখে যাচ্ছিলেন ঠিক। এইসময় রচিত তাঁর দুটি ছোট উপন্যাসের একটির নাম 'প্রতিজ্ঞা', অপরটির নাম 'নির্মলা'। 'গবন' (অপহরণ) নামে একটি বড় উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। এ-ছাড়া লিখেছিলেন বেশ কয়েকটি ছোট গল্প। বারাণসীতে প্রেস তৈরি করা নিয়ে যখন তিনি খুব ব্যস্ত তখনও তিনি লেখা থামান নি। কাজকর্মের বেশ চাপ এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঠিক লেখার সময় বার করে নিতেন। এই সময় তিনি বেশ বড় দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রথমটির নাম 'রঙ্গভূমি', দ্বিতীয়টির নাম 'কায়াকল্প। 'সংগ্রাম' এবং 'কারবালা' নামে দুটি নাটকও লিখেছিলেন। অনেকগুলি ছোটগল্প এবং গদ্য রচনাও ছিল এই সময়ের ফসল। এবার বারাণসীতে ফিরে এসে আর একটি বড় উপন্যাসে তিনি হাত দিলেন। 1931—32 সালের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসটির নাম 'কর্মভূমি।' একজন অতন্দ্র প্রহরীর মতো জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী তিনি সবসময় লক্ষ্য করতেন। তিনি ছিলেন উদ্দেশ্যের প্রতি একমুখী। এইটি ছিল তাঁর মস্ত গুণ। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং ভারতীয় পার্লামেণ্টের একজন সদস্য শ্রীবানারসী দাস চতুর্বেদীকে প্রেমচন্দ একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিটিতে তাঁর মানসিক গঠন সম্পর্কে একটি চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়ঃ

"আমার জীবনে উচ্চাশা বলে কিছু নেই। এই মুহূর্তে আমার জীবনে যদি কোনো উচ্চাশা থেকে থাকে, সেটি হল জাতীয় আন্দোলনে আমাদের জয়লাভ। অর্থ বা যশের জন্য আমার কোনো আকাঙ্খা নেই। বেঁচে থাকার জন্যে যতটুকু দরকার, ততটুকু আমার আছে। গাড়ি-বাড়ির প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। এ-কথা ঠিক যে, আমি কিছু সত্যিকারের ভাল বই লিখতে চাই, কিন্তু তার ফলে আমার উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। আমার উদ্দেশ্য, স্বরাজের লড়াইয়ে আমাদের জয়। আমার

with this problem & had only such members as believed in a common language it shall have brought out a magazine in a common language in different scripts. It would have been a real service. At present its activities are communal and it has failed to justify its existence.

Certainly Hindustani is not a literary language in form and magnificence & grandeur. Literary language is supposed to be something apart from the spoken language. I believe in our literary expression coming as near as possible to spoken speech. At least in drama, story & novel we can write in popular language, including biography and travel, and these branches comprise three fourths of literature & that which really matters. Your science & philosophy may be written in Sanskrit or Prakrit I don't care. As Garson de Tassy says 'to drag Hindi to its ancient moorings is the vain effort to turn the river's flow to its source."

About the books I have asked my son to give you an account with whom he deposited the books. You may not be aware, my both children are at Kayastha Patshala Intermediate School and lodging in the same building as Hindustani Academy. But they are shy extremely which they seem to have inherited from me supposing I am their father. His name is Sripat Rai. If you can send for him and ask an explanation he will tell you what became of the books.

Lekhak Sangha. Its only fruitful activity is in my opinion cooperative publication, so that every author contributing to its membership may be assured a royalty of 30 to 40%. The Hindi market is so dull and authors are so anxious to get their books published that they will come to any compromise with the publishers. If they stick to their terms & publisher refuses to publish their books, the poor fellow will be nowhere. The analogy is that

তাঁর হাতের ইংরাজী অক্ষর

মুন্সী প্রেমচন্দ—1925

দুই ছেলেকে নিয়েও আমার কোনো উচ্চাশা নেই। তাদের সম্পর্কে আমার এইটুকুই আশা যে, তারা সৎ হোক, তাদের মনোবল অটুট থাকুক। আমি কখনই চাই না যে, আমার ছেলেরা বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাক। আমাকে যেন কখনই দেখতে না হয় যে, তারা পয়সা-কড়ির জন্যে হ্যাংলামো করছে, কিংবা কর্তৃপক্ষের তোষামোদ করে চলেছে। আমি কর্মহীন বিশ্রামের জীবন চাই না। আমি সাহিত্য এবং আমার দেশের জন্য সবসময় কিছু-না-কিছু করতে চাই। আমার প্রয়োজন অতি সামান্য। একেবারে সাধারণ পরণের কাপড়, মোটা ভাত, তরকারি, আর তার সঙ্গে সামান্য একটু মাখন হলেই দিব্যি আমার চলে যাবে।"

কলকাতায় গিয়ে জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে আলাপ করার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রেমচন্দ বানারসীদাসকে আর একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিন বছর পরে লেখা এই চিঠিটি প্রেমচন্দের অন্তর্জীবনের প্রতি আলোকপাত করে ঃ

"পৃথিবীতে বিখ্যাত লোকের অভাব নেই। কিন্তু তোমাকে চিনতে হবে, কে সত্যিই অসাধারণ, আর কে ভণ্ড। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবতেই পারি না যে, একজন মহৎ ব্যক্তি ধনসম্পদের মধ্যে ডুবে আছেন। একজন ধনী লোক যখন শিল্প নিয়ে বড়-বড় কথা বলে, কিংবা জ্ঞানের বুলি আওড়ায়, আমি সহ্য করতে পারি না। আমার মনে হয় এই লোকটা বর্তমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে। এই সমাজ-ব্যবস্থায় ধনীরা গরিবদের শোষণ করে·· হতে পারে, আমার এই মানসিক অবস্থার পেছনে আমার নিজের জীবনের ব্যর্থতা কাজ করেছে। ব্যাঙ্কে আমার বিস্তর টাকা পয়সা থাকলে আমি আর পাঁচজনের মতো হতাম—ধনসম্পদের লোভ আমার পক্ষে এড়ানো সম্ভব হত না—কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমি সুখী। আমার ভাগ্য এবং প্রকৃতি গরিবদের সঙ্গে আমাকে একাসনে বসিয়েছে। এর ফলে আমি অবশ্য আত্মিক শান্তি পেয়েছি।"

যথার্থই তাঁর আত্মিক শান্তি ছিল। এই সময় তিনি নিবিষ্ট চিত্তে 'কর্মভূমি' লিখছিলেন। এর পরে লেখেন 'গোদান'। অনেকগুলি গল্পও তিনি এইসময় লিখেছিলেন। এ-ছাড়া তিনি দুটি পত্রিকা চালাচ্ছিলেন। ব্রিটিশের ওপর তাঁর আক্রমণ ছিল অব্যাহত। এইসব কাজে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন।

তাঁর তৈরী বাড়ি
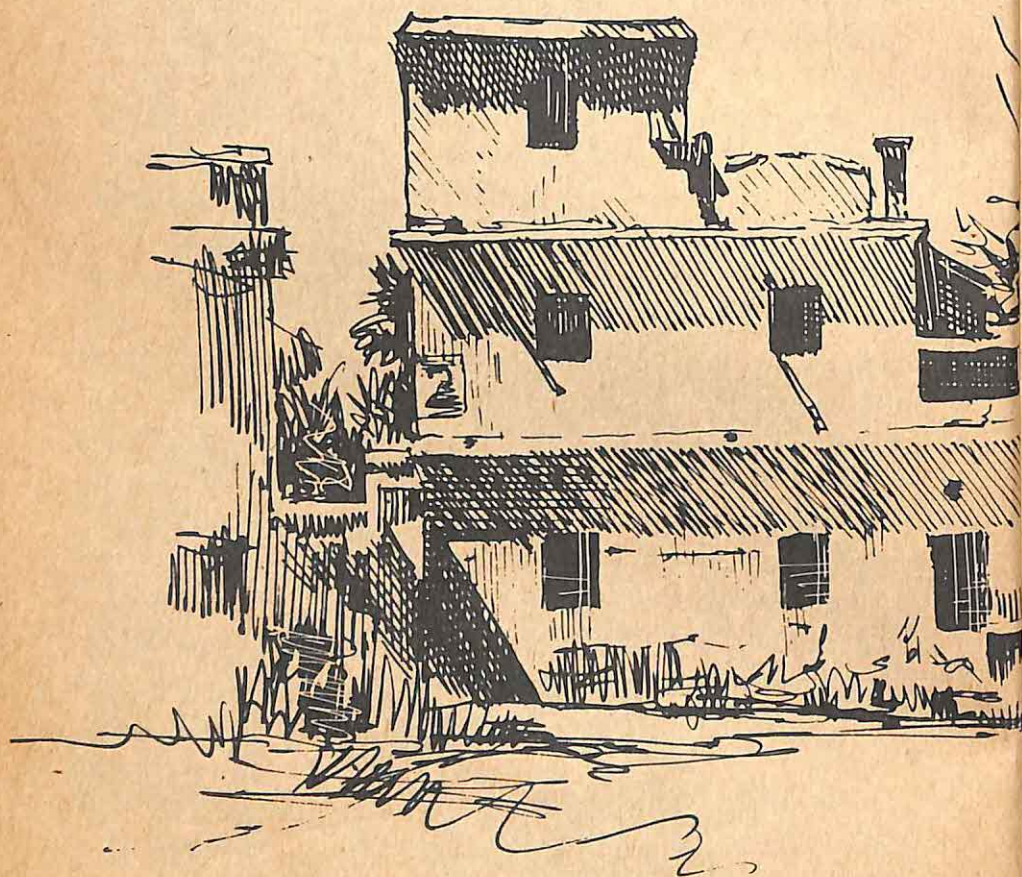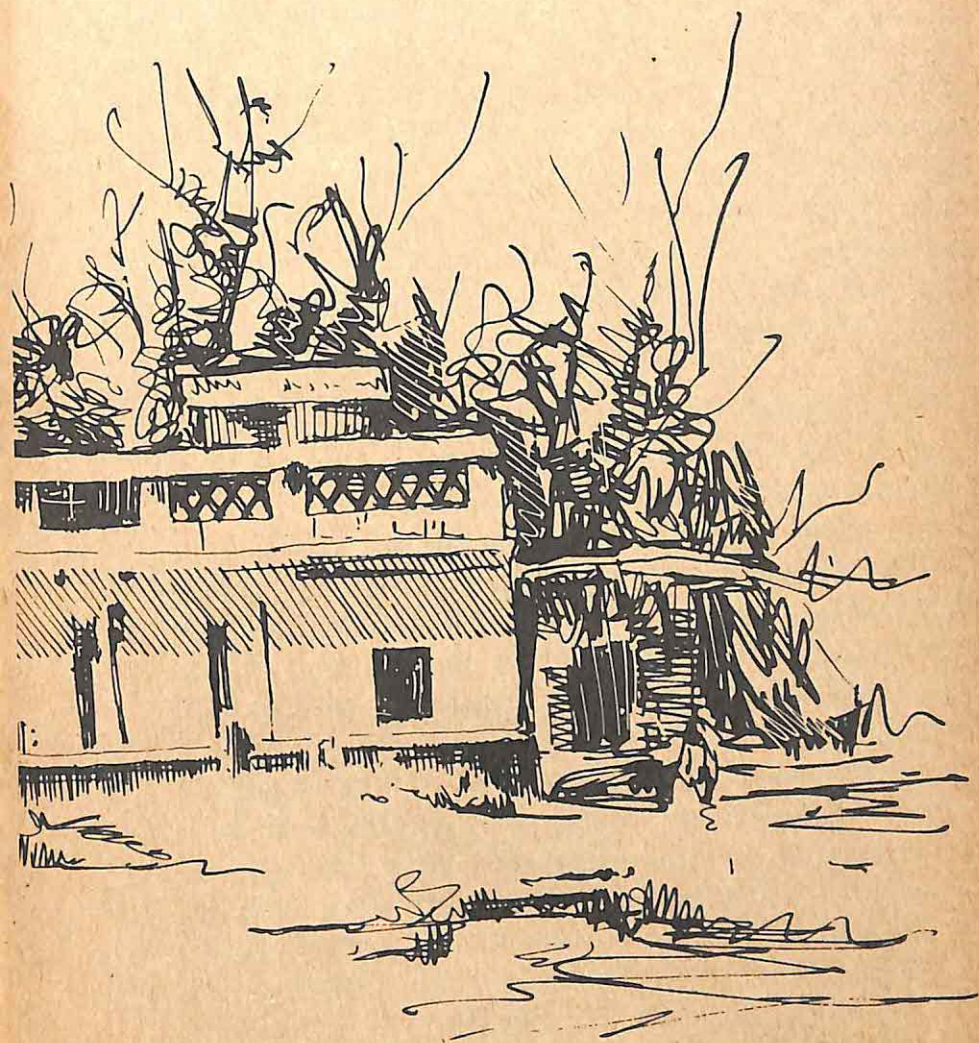
কিন্তু অর্থনীতি এসব বোঝে না। অর্থনীতি চলে তার নিজস্ব নিয়মে। কারও আত্মসন্তুষ্টি কিংবা কারও আত্মিক শান্তি নিয়ে অর্থনীতি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। তার একমাত্র নীতি অর্থ। এবং এই অর্থ প্রেমচন্দের ধরতে গেলে কিছুই ছিল না। দুটি পত্রিকা চালাতে গিয়ে তাঁর বিস্তর ধার-দেনা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গতির তুলনায় ধারের বোঝা হয়ে পড়েছিল বিরাট। এইসময় তিনি বোম্বের অজন্তা সিনেটোনের মোহন ভাবনানির কাছ থেকে একটি চাকরির প্রস্তাব পান। চলচ্চিত্র জগতে চাকরি করার একটুও ইচ্ছে ছিল না প্রেমচন্দের, কিন্তু এসময় ওসব ভাবার মতো অবস্থা ছিল না তাঁর। টাকা শোধ দেবার জন্য সবাই তাঁকে খুব তাগাদা দিচ্ছিল। টাকা চাই, সুতরাং ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তিনি ভাবনানির সঙ্গে এক বছরের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। প্রেমচন্দ যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হল, তিনি দেখলেন চলচ্চিত্র জগতে তিনি একজন সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিনি উপন্যাসিক জ্ঞানেন্দ্র কুমারকে লিখলেন :

"...যা ভেবেছিলাম তার কিছুই এখানে করা গেল না। প্রযোজকরা বাঁধা গতের গল্পের বাইরে এক ইঞ্চিও যেতে রাজী নয়। তাদের কাছে অশালীনতাই একমাত্র বিনোদনের বস্তু।"

হায়দরাবাদের শ্রীযুক্ত ঘোরির কাছে তিনি লিখলেন :

"...চলচ্চিত্রের ভাগ্য যাদের হাতে সেইসব লোকগুলো দুর্ভাগ্যক্রমে এটিকে ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। জনরুচি কিংবা এর সংস্কার নিয়ে ব্যবসার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ব্যবসা শুধুমাত্র শোষণ করতে জানে, চলচ্চিত্র-ব্যবসা জনসাধারণের অনুভূতিকে নষ্ট করেছে।"

এসব নিয়ে প্রেমচন্দের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হল। ঠিক করলেন বছর শেষ হবার আগেই তিনি এখান থেকে সরে পড়বেন। ভাবনানি তাঁকে আরও এক বছর থাকার জন্যে অনুরোধ করলেন, কিন্তু প্রেমচন্দ মত পাল্টালেন না। তিনি নিজের গ্রামে ফেরার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ইংলণ্ড থেকে সদ্য-প্রত্যাগত হিমাংশু রায় প্রেমচন্দকে আবার চুক্তিবদ্ধ করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি 'চলচ্চিত্রের রঙিন জগৎ থেকে' তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে চাইলেন। এইসময় তিনি জ্ঞানেন্দ্রকে লিখলেন :

"আমাকে এবার উপন্যাসটি (গোদান) শেষ করতে হবে। এখানে

বসে লেখা অসম্ভব। আমাকে বম্বে ছেড়ে আগের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। ওখানে টাকা-পয়সা নেই সত্যি, কিন্তু ওই জায়াগাটা এখানকার চাইতে হাজারগুণ ভাল। এখানে আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছে, আমি আমার জীবনটা নষ্ট করছি।”

6

প্রেমচন্দ বম্বে ছাড়লেন 1935 সালের 4 এপ্রিল।

মোট দশমাস ছিলেন বম্বেতে, এই সময় তাঁর শরীর খুব ভেঙে পড়ে। বারাণসীতে যখন ফিরে এলেন তখন তিনি বেশ অসুস্থ, লিভারের অবস্থা খারাপ। অথচ তিনি বিশ্রাম নিতেন না একদম। 'গোদান'-এর কথা সবসময় তাঁর মাথায় ঘুরত। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটিই ছিল তাঁর সবচাইতে বড় কাজ। এই উপন্যাসটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। (জাতিপুঞ্জের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার এশীয় সাহিত্য শাখা থেকে সম্প্রতি উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।) এই উপন্যাসটিতে একটি সৎ এবং ধর্মভীরু কৃষকের দুঃখকষ্ট এবং মৃত্যুর কথা লেখা হয়েছে। গ্রামে ধনীরা কী ভাবে গরীবদের শোষণ করে তার বিস্তৃত বিবরণও আছে উপন্যাসটিতে। বইটিতে একদিকে আছে প্রবল সমবেদনা, অপরদিকে আছে প্রচণ্ড রাগ—এই রাগ গ্রামের শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। নানারকম দুঃখকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে 1936 সালের প্রথমদিকে প্রেমচন্দ এই উপন্যাসটি শেষ করলেন। এবং তারপরেই যথারীতি অপর একটি উপন্যাস রচনার কাজে হাত দিলেন, এই উপন্যাসটির নাম 'মঙ্গলসূত্র'। এই উপন্যাসটির নায়ক দরিদ্র, কিন্তু প্রতিভাবান লেখক। বোঝাই যায় প্রেমচন্দ উপন্যাসটির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন নিজের জীবন থেকে, কিন্তু উপন্যাসটির শেষ আমরা জানতে পারলাম না, কেননা এটি শেষ হবার আগেই তিনি মারা যান।

1935 সালে ইংলণ্ডবাসী একদল তরুণ ভারতীয় লেখক ভারতীয় প্রগতিবাদী লেখক-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের মধ্যে মুলক রাজ আনন্দ এবং সাজ্জাদ জহীরও ছিলেন। এই সংস্থা 1936 সালের এপ্রিলে লখনউতে এদের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করল। ঐ সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল প্রেমচন্দকে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। কারণ এই সংস্থার কার্যক্রমে তাঁর সায় ছিল পুরোপুরি। ইংলণ্ডে ঐ লেখক-সংস্থা স্থাপিত

হবার খবর পেয়েই তিনি তাঁর নিজের পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখে এদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ঐ সম্মেলনে তাঁর ভাষণ এই নতুন আন্দোলনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। প্রেমচন্দ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যের কাজ হল মানুষের সামাজিক এবং আত্মিক উন্নতি সাধন। এই কথা তিনি সারা-জীবন ধরে বিশ্বাস করে গেছেন। এই মতে বিশ্বাসী একদল তরুণ লেখককে পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

আর একটি বিষয় নিয়েও তিনি গভীরভাবে ভাবতেন, সেটি হল ভাষা। তাঁর স্থির ধারণা ছিল, দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা হিসেবে হিন্দী এবং উর্দুর অস্তিত্ব উভয় ভাষার পক্ষেই ক্ষতিকর। দুটি ভাষারই প্রখ্যাত লেখক প্রেমচন্দ ভেবেছিলেন, এই দুটি ভাষার মধ্যে তিনি একটি সেতুর কাজ করবেন। এবং এর থেকেই হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে দুটি ভাষা মিশে গিয়ে একটি ভাষায় দাঁড়াবে। এই চিন্তা তাঁকে এতই পেয়ে বসেছিল যে, শেষ বয়েসে এটিই ছিল তাঁর বৃহত্তম পরিকল্পনা। এই মতের সমর্থন পাবার আশায় তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। লখনউ থেকে সোজা চলে গেলেন লাহোরে, আবার সেখান থেকে নাগপুরে। নাগপুরে তখন গান্ধীজীর সভাপতিত্বে সাধারণ

তাঁর ব্যবহারের সামগ্রী
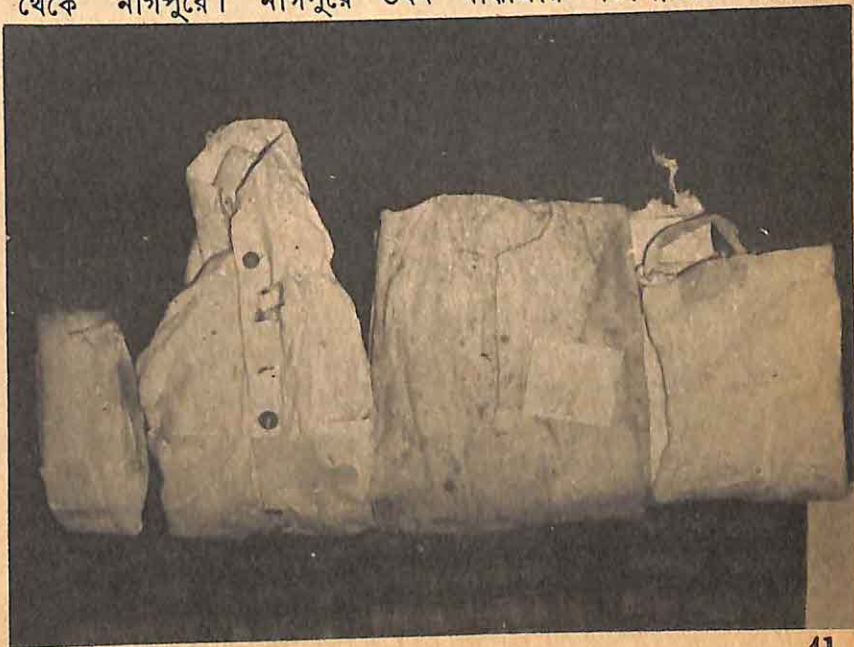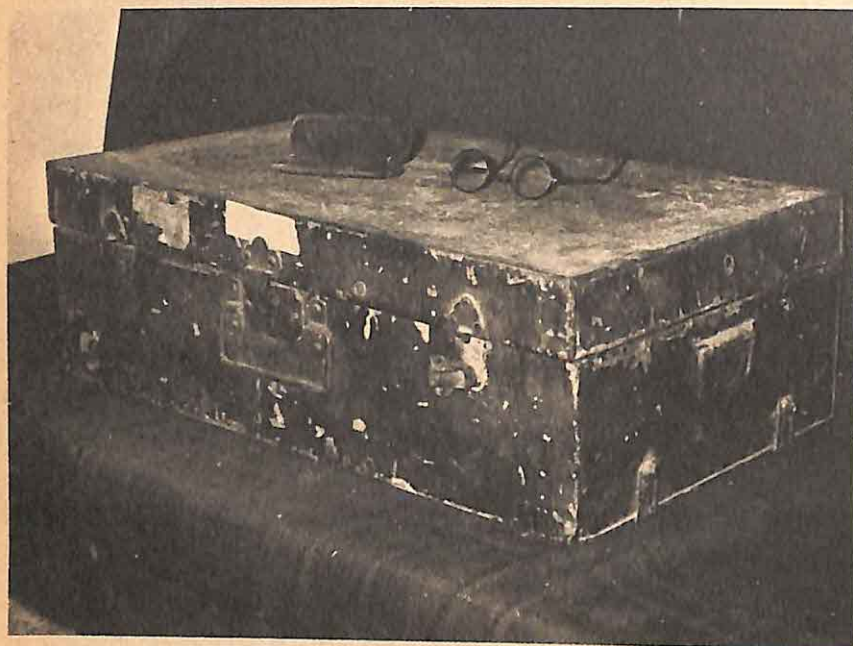
প্রেমচন্দের বাক্স ও চশমা

হিন্দুস্থানী ভাষা নিয়ে একটি সভা হবার কথা হচ্ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রেমচন্দ বুঝে গেলেন যে, তাঁর স্বপ্ন সফল হবার নয়, তিনি এতদিন একটি মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। যাঁরা ভাষার শুদ্ধতা চান তাঁরাই তাঁর স্বপ্নকে হত্যা করলেন। এই ঘটনায় প্রেমচন্দের মনে খুব আঘাত লেগেছিল।

আর একটি আশাভঙ্গ ঘটল এই সময়। প্রায় দুই দশক ধরে তিনি স্বপ্ন দেখে আসছিলেন যে, মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে ধনীরা তাদের বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করবে। কিন্তু এই শেষ বয়েসে পৌঁছে তিনি জানলেন, এটা একেবারেই অসম্ভব, যেমন অসম্ভব চিতাবাঘের গায়ের ছাপ তুলে ফেলার কথা ভাবা। তাঁর এই আশাভঙ্গের চিত্র যে কী করুণ তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'মঙ্গলসূত্রের' এই কথা-গুলি পড়লে :

"হ্যাঁ, দেবদূতরা আছে, তাঁরা থাকবেনও চিরকাল। তাঁরা এখনও দেখছেন যে, পৃথিবী ন্যায়নীতি এবং ধর্ম মেনে চলছে। তাঁরা শহীদ হন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু কেন তাঁদের দেবদূত বলব ? তাঁদের

ভীতু বলা উচিত, তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। একজন দেবদূত তাঁকেই বলব যে তাঁর সারাজীবন দিয়ে ন্যায়নীতির সমর্থন করে। কেউ যদি সবকিছু জেনেও না জানার ভাণ করে তাহলে সে নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়। আর যদি দেখা যায়, এইসব কু-ব্যবস্থা তাকে আঘাত করছে না, তাহলে বলতে হবে সে অন্ধ এবং নির্বোধ, সে দেবদূত নয়। এখানে দেবদূতদের কোনো জায়গা নেই। এই দেবদূতরাই আসলে ভাগ্য, ঈশ্বর এবং উপাসনার নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে। মানুষরা এবার এদের ধ্বংস করবে, কিংবা এই সমাজটাকেই পুড়িয়ে দেবে। যেভাবে সবকিছু চলছে তার চাইতে এই সমাজটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হাজারগুণ ভাল। না, আমরা মানুষ হয়ে মানুষের মধ্যে বাঁচতে চাই। চারদিকে জন্তু-জানোয়ার আছে বলে আমাদের সশস্ত্র হতে হবে। আমাদের ছিঁড়ে খেতে দেওয়া বোকামি, মহত্ত্ব নয়।"

1936 সালের গ্রীষ্মকাল। প্রেমচন্দ তাঁর "হিন্দুস্থানী" সফর থেকে ফিরে এসেছেন। ভীষণ ক্লান্ত, কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। আগের মতো ভোর রাত্তিরে উঠে লিখতে বসতেন। তিনি এমনভাবে লিখে যেতেন যে, মনে হত, না লিখে তাঁর উপায় নেই। কিংবা তিনি বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর বিদায়ের দিন এসে গেছে, সুতরাং তাঁর যা-কিছু বলার আছে সব এক্ষুনি বলে ফেলতে হবে, সব অর্থাৎ তাঁর কঠিন জীবনের অভিজ্ঞতার মূল কথা। উপন্যাসটি লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'কফন' (শবাচ্ছাদন) নামে একটি গল্প লেখেন। এই গল্পটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটিতে দেখানো হয়েছে দৈন্যদশা একটি মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করেছে কীভাবে। 'মহাজনী সভ্যতা' নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন এইসময়। এই প্রবন্ধটিতে তিনি ধনতন্ত্রের নিন্দা করেছিলেন, এবং প্রশংসা করেছিলেন সমাজতন্ত্রের। এই লেখাগুলিকে লেখকের শেষ দলিল বলা যেতে পারে, এগুলিতে লেখা আছে মানুষকে তিনি কী গভীরভাবে ভালবাসতেন।

যাই-হোক, দুর্বল শরীর এত চাপ সহ্য করতে পারল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 1936 সালের 25 জুন তিনি রক্তবমি করলেন। ডাক্তাররা বললেন, গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়েছে। অনেক ডাক্তারকে দেখানো হল, চিকিৎসা-পদ্ধতিও পাল্টানো হল বেশ কয়েকবার, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাঁর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। আগে সন্দেহ হয়েছিল গ্যাস্ট্রিক আলসার, এখন কেউ বললেন ওটা আসলে উদরী রোগ, কেউ বললেন যকৃতের অসুখ। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই বিদঘুটে
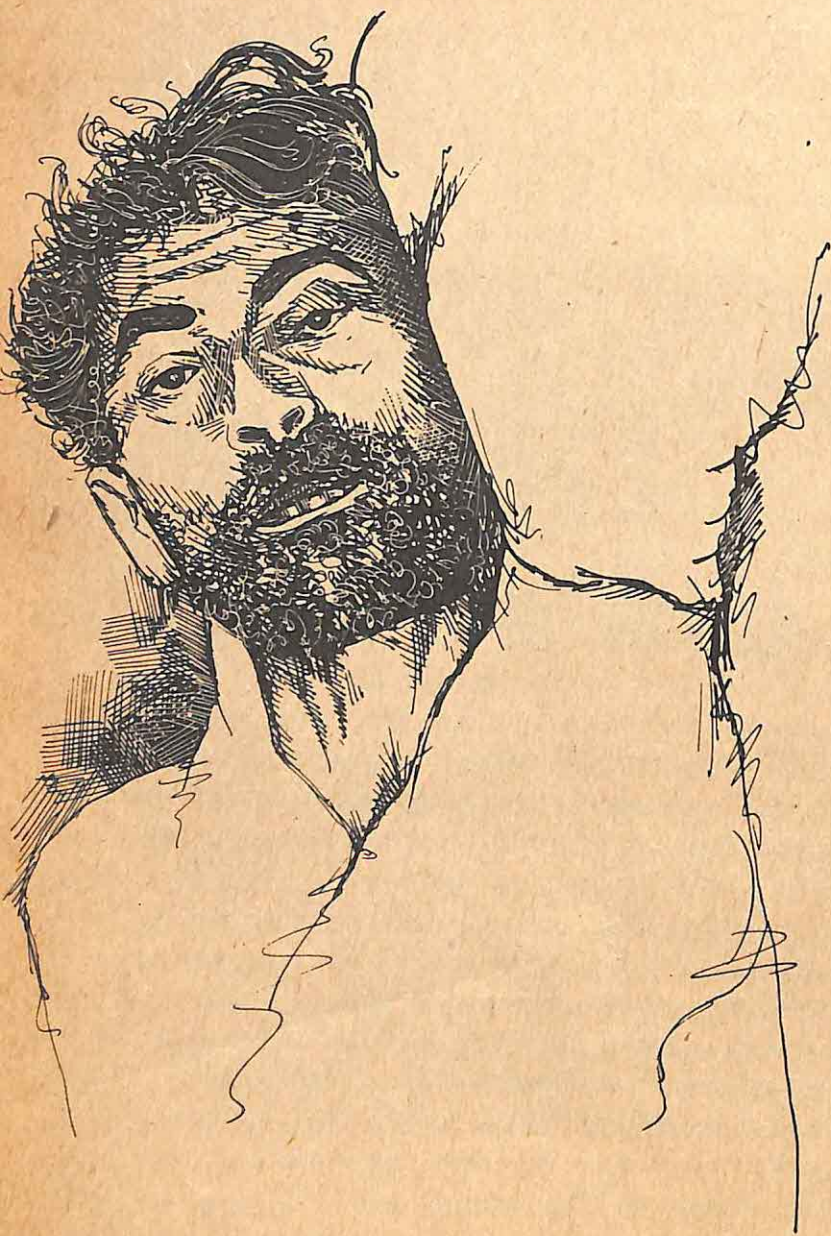
শেষবারের অসুখ

নামগুলোর মানে ধরতে পারলেন না প্রেমচন্দ। তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকেরাও কিছুই বুঝতে পারল না। প্রেমচন্দের অসহ্য ব্যথার উপশম হল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা তাঁকে কাতর করতে পারেনি। তাঁর আত্মিক শান্তি বজায় ছিল। সুতরাং ভগবানকে ডাকা কিংবা ধর্মকথা শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সৃষ্টিশীল হয়ে বেঁচে ছিলেন। এর বেশি আর কী পাওয়া সম্ভব! এখন অনায়াসে সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, তিনি চলে গেলে তাঁর প্রিয়জনেরা খুব দুঃখ পাবে, কিন্তু আর কী করা যাবে! তিনি বিবর্ণ এবং অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর চোয়াল বসে গিয়েছিল, অসহ্য যন্ত্রণা—কিন্তু এসব তাঁর প্রশান্তি নষ্ট করতে পারেনি। 1936 সালের 8 অক্টোবর সবাইকে শোকে বিমূঢ় করে তিনি মারা যান। আত্মীয়-বন্ধু মিলে গ্রামের জনা বারো লোক তাঁর শেষ-কৃত্য করল। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল খুবই সাধারণভাবে, শেষও হল ঠিক সেইভাবে।

প্রেমচন্দের ঈদগাহের একটি দৃশ্য
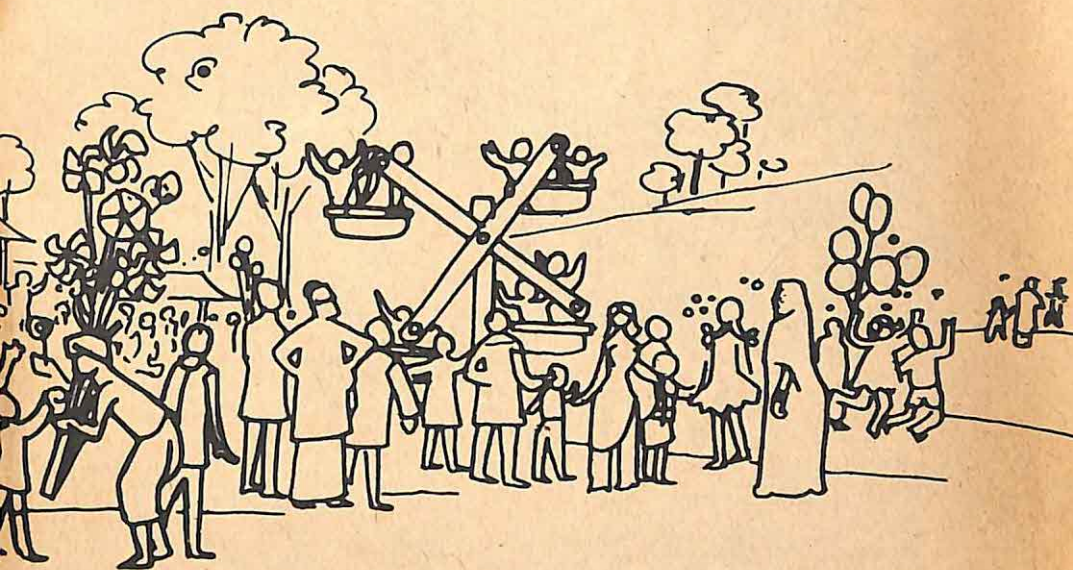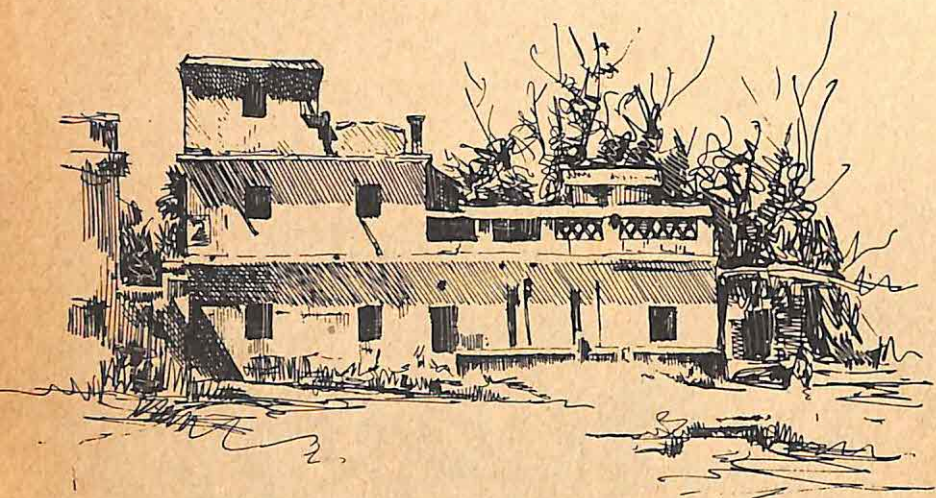
এই সিরিজের অন্যান্য বই

প্রতিটি বই দেড় টাকা

বাপু (১ম ও ২য়)	…	এফ সি ফ্রিটাস অনু : মহাশ্বেতা দেবী
কাশ্মীর	…	মালা সিং অনু : মহাশ্বেতা দেবী
রেড ক্রস কাহিনী	…	কৃষ্ণ সত্যানন্দ অনু : মহাশ্বেতা দেবী
সোনার অভিযান	…	তারা তেওয়ারী অনু : আদিত্য সেন
রূপা নামে হাতিটি	…	মিকি প্যাটেল অনু : আদিত্য সেন
সে অনেক কালের কথা (২য়)	…	এম· চোকসি ও পি, এম. যোশী অনু : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
সকলের সাথী সকলের বন্ধু	…	উমাশঙ্কর যোশী অনু : ক্ষিতীশ রায়
ফুল ও মৌমাছি	…	অশোক দাবার অনু : ইন্দ্রাণী সরকার
অযোধ্যার রাজকুমার	…	হংস মেহতা অনু : বুদ্ধদেব ঘোষ
হকি খেলায় ভারত	…	শরদিন্দু সান্যাল অনু : কিষণ চাঁদ বর্মন

ছোটদের দু'টি বই

এশিয়ার রূপকথা	…	অনু : হিমানীশ গোস্বামী ১২ টাকা
ডাক টিকিটের মজার কাহিনী (২য় সং)	…	সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনু : নিতাই চট্টোপাধ্যায় ২.৫০ টাকা
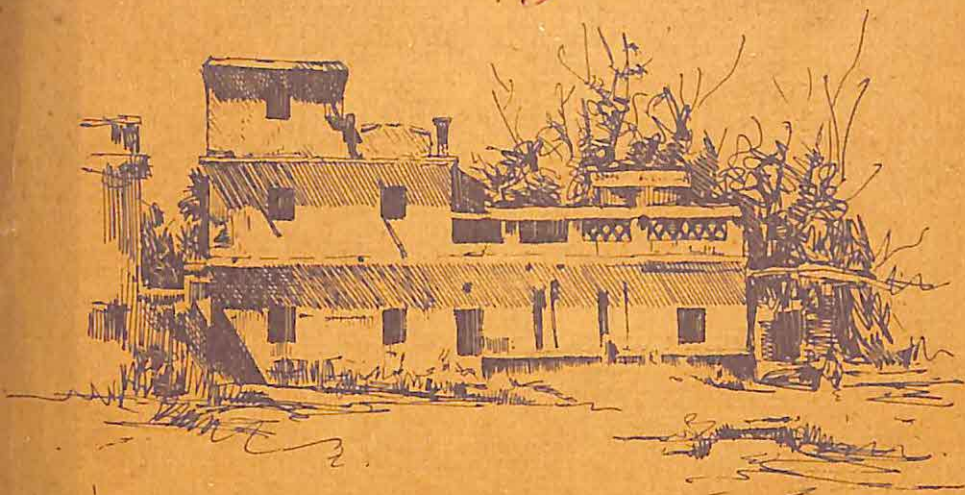
এই পুস্তকটি একটি সুন্দর রঙ্গাত্মক অনুভূতিপ্রবণ গভীর জীবনচরিত। লেখকের চিঠিপত্র এবং রচনার উদ্ধৃতির দ্বারা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। বইখানি সহজ ও সরল ভাষায় লিখেছেন প্রেমচন্দের পুত্র সুপরিচিত লেখক অমৃত রাই।